ভূমিকা

ইংরেজীতে একটি কথা আছে : "War is too serious a business to be left to the generals." সব দেখে শুনে আমরাও তেমনি বলতে পারি, "Politics is too serious a business to be left to the politicians." পলিটিসিয়ানদের কৃতকর্মের ফল আমাদেরও ভোগ করতে হয়। সুতরাং আমরাও নাগরিক হিসাবে দু চার কথা বলতে পারি। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে : "A cat may look at a king." তা যদি হয় তবে আমরাই বা আমাদের রাজাদের দিকে তাকাতে পারব না কেন ?

আমার এই প্রবন্ধ পর্যায়ের বেশীর ভাগই সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাসংক্রান্ত। সমসাময়িক হলেও এর জের মিটতে দীর্ঘকাল লাগবে। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে বলতে পারে ? কেউ কি জানত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিজের দেহরক্ষীর হাতে নিধন হবে ? দেশের অবস্থা টালমাটাল। বিশ্বের অবস্থাও তাই। মহাযুদ্ধ তুচ্ছ একটা ঘটনাকে উপলক্ষ করে হঠাৎ বেধে যেতে পারে। এবার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিশ্চিত। যার হাতে যে অস্ত্র আছে সে তা প্রয়োগ করতে বাধ্য। না করলে পরাজয়। জয়ের জন্যেই গতবার হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বর্ষিত হয়েছিল। অন্তত জয়কে ত্বরান্বিত করতে। আমরা মূর্খের স্বর্গে বাস করব, যদি মহাযুদ্ধকে বাধতে দিই আর মহাযোদ্ধাদের কাছে প্রত্যাশা করি যে তাঁরা কেউ পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবেন না। যুদ্ধের ফলাফল এবার জয় পরাজয়কে অবাস্তব করবে, কারণ সবাই স্বর্গে যাবে, কেউ মহী ভোগ করার জন্যে বেঁচে থাকবে না। "গীতা" বা "কোরান" কোনো শাস্ত্রই আর মানবজাতিকে সান্ত্বনা দিতে পারছে না।

প্রধানত রাজনৈতিক প্রবন্ধ দিয়েই এই প্রবন্ধমালার শুরু। পরে অন্য জাতের প্রবন্ধও দেওয়া হয়েছে। আমার অশীতিপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ৩রা মার্চ ১৯১৫ তারিখে আমি যা পাঠ করেছিলুম তা এই ভূমিকার সামিল করা হলো।

"আমার মধ্যে অনেকগুলি ব্যক্তি একসঙ্গে বাস করছে। তাদের একজন হচ্ছে আর্টিস্ট বা কবি কথাসাহিত্যিক। আরেকজন হচ্ছে ভাবুক, যার মতো একজনের মূর্তি গড়েছেন ফরাসী মহাশিল্পী রদ্যাঁ। সে সব সময় ভাবে কোনটা সত্য কোনটা অসত্য। আরো একজন আছে সে হচ্ছে ধ্যানী বা স্বপ্নদ্রষ্টা বা মিষ্টিক। এর কিছু মিষ্টিক উপলব্ধিও হয়েছে। ইনটেলেক্ট নয়, ইনটুইশন এর মার্গ। আরো একজন

আছে সে হচ্ছে রসিক বা প্রেমিক। সে মানুষকে ভালোবাসে, মানুষের ভিতর দিয়ে ভগবানকে। নারী তার হাত ধরে তাকে ভগবানের সন্ধানে নিয়ে যায়। আরো একজন আছে সে সৌন্দর্যের পশ্চাদ্ধাবন করছে তপতীর পশ্চাতে সংবরণের মতো। তাকে ধরতে পারছে না। খাল বিল পাহাড় পর্বত নর্দমা আস্তাকুড় পার হয়ে ছুটেছে। আরো একজন আছে যে ন্যায় অন্যায় তৌল করে। কোনটা রাইট কোনটা রং। সে বিবেকজর্জর। আরো একজন আছে যে ম্যান অভ অ্যাকশন। সরকারী চাকরিতে সে ধাঁ দৌড় করেছে, অল্প সময়ের মধ্যে কঠিন সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সব সিদ্ধান্তই যে ঠিক তা নয়, তবে কাউকে গুলি করে মারতে বা ফাঁসীতে ঝোলাতে হুকুম দেয়নি। চাকরিতে থাকলে হয়তো এমনি কিছু করতে হতো। আরো একজন আছে যে বিভিন্ন পাবলিক ইস্যুতে লেখনীক্ষেপ করেছে। জনপ্রিয়তার দিকে তাকায়নি। এক একটা লেখা ফলপ্রসূ হয়েছে। হয়তো তক্ষুনি নয়, অনেক পরে। তা সত্ত্বেও তাকে শুনতে হয়েছে বুদ্ধিজীবীরা কেন নীরব।

যার মধ্যে এতগুলো ব্যক্তি বিরাজ করছে সে ব্যক্তি জ্যাক অভ অল ট্রেড্স্ হতে পারে, কিন্তু কোনো একটি ক্ষেত্রে মাস্টার হতে পারে না। এ নিয়ে অনেক সময় আফসোস করেছি, কিন্তু আমার যা স্বভাব তাই আমাকে চালিত করেছে। বিরক্ত হয়েছি, তবু লোকের অনুরোধ উপরোধ ঠেলতে পারিনি। বিস্তর বাজে লেখা লিখেছি। বাজে কাজে জড়িয়ে পড়েছি। তা সত্ত্বেও আমি একাদিক্রমে ছয় খণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাস লিখতে পেরেছি। তারপরে তিন খণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাস। তারপরে চার খণ্ডে সমাপ্য উপন্যাসের তিন খণ্ড শেষ করতে পেরেছি। বাকী এক খণ্ড লিখছি। এটা শেষ হলে আমার জীবনের কাজ মোটামুটি সারা হবে। কিন্তু তাই বা কেমন করে বলি? কবিতা লেখা স্থগিত রয়েছে, ব্যালাড লেখার সংকল্প আছে, আরো একটা ছোট উপন্যাসের কল্পনাও লালন করছি, তাছাড়া 'বিনুর বই'য়ের দ্বিতীয় পর্ব লেখা উচিত মনে করি।

আয়ুষ্কালকে অযথা প্রলম্বিত করে কী হবে? আমি বিশ্বাস করি যে মানব-জীবনই শেষ জীবন নয়, এই অনাদি অনন্ত জগতে কত কী দেখবার আছে, দেখতে হবে। করবার আছে, করতে হবে। হবার আছে, হতে হবে। এই জীবনটা পুরোপুরি নিখুঁত না হলেও নিতান্ত অসার্থক বা অচরিতার্থ না হলেই আমি তুষ্ট। নামটা মুছে গেলেও খেদ থাকবে না। এখনো কিছু দেবার আছে। দিয়ে যেতে পারলেই আমি ধন্য।" *

সমাজ-রাজনীতি

জীবনস্মৃতি

শিল্প-সাহিত্য

শ্রীচিন্তামণি কর

করকমলেষু

যুদ্ধ ও শান্তি

মহাবীর নেপোলিয়নের ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকে একটানা একশো বছর বড়ো মাপের যুদ্ধবিগ্রহ হয়নি। তাই মানুষ বেশ শান্তিতেই বাস করছিল ও শান্তির ছায়ায় সাহিত্যে বিজ্ঞানে শিল্পে বাণিজ্যে অভূতপূর্ব প্রগতি করেছিল। মনীষীরা মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মহান সব স্বপ্ন দেখেন। তাঁদের শিষ্যদের কারো সন্দেহ ছিল না স্বপ্ন একদিন সত্য হবে। এমন কি বিপ্লবের স্বপ্নও। তার জন্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে না। স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দেরও ধারণা, শান্তি-পূর্ণ ভাবেই ব্রিটেন তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবে।

কিন্তু শান্তির জন্যে প্রার্থনা করলেও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি সর্বত্র চলেছিল। কোথাও কম, কোথাও বেশি। কোথাও স্থলে, কোথাও জলে। পরবর্তীকালে অন্তরীক্ষে। আমাদের কালে মহাশূন্যে। ফ্রান্স থেকে শুরু করে প্রায় প্রত্যেকটি ইউরোপীয় দেশেই যুদ্ধকালে কনসক্রিপশন হয় মূল নীতি। সেই জন্যে শান্তিকালেও যুবকদের সবাইকে যুদ্ধের জন্যে ট্রেনিং নিতে বাধ্য করা হয়। ব্যতিক্রম ছিল ব্রিটেন। সাগরপারে আমেরিকা। কিন্তু জাপান তার নব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানীর ও রাশিয়ার অনুসরণ করে। ওদিকে ব্রিটেন ও আমেরিকা জোর দেয় যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণে। যাতে নৌ-যুদ্ধে অজেয় হয়। জাপান তাদেরও অনুসরণ করে।

উপনিবেশ না থাকলে কলকারখানার জন্যে কাঁচামাল সুবিধা দরে কেনা যায় না, তৈরি মাল সুবিধা দরে বেচা যায় না। উপনিবেশের জন্যে রেষারেষি বেধে যায়। তাতে যোগ দেয় জার্মানী তথা জাপানও। জার্মানরাও যুদ্ধ জাহাজ বানাতে শুরু করে দেয়। তখন ইংরেজরা প্রমাদ গণে। উভয়ের সম্পর্ক এতদিন মধুর ছিল।

কিন্তু এরপর তিতিয়ে যায়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া মিলে তিন মিত্রশক্তি হয়। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেয় জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্ক এই তিন ইয়ার। এরা এক মুখে শান্তির বন্দনা করে, আরেক মুখে যুদ্ধের অর্চনা। বুদ্ধিমানরা বলেন, যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়াই শান্তির জন্যে প্রস্তুতি। এঁদের সকলের দৃষ্টি শক্তিসাম্যের উপরে। যাকে বলে ব্যালান্স অব পাওয়ার। এটা মোটের উপর রক্ষিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে টালমাটাল অবস্থা। মহাযুদ্ধ এই বাধে কি ওই বাধে। ব্যালান্স নড়িয়ে দিচ্ছে জার্মানী।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে সামান্য একটা কারণে অস্ট্রিয়াতে সার্বিয়াতে যুদ্ধ বেধে যায়। সার্বিয়া দুর্বল, তাই তার পক্ষ নেয় রাশিয়া। রাশিয়ার চেয়ে অস্ট্রিয়া দুর্বল, তাই তার পক্ষ নেয় জার্মানী। জার্মানীর চেয়ে রাশিয়া দুর্বল, তাই তার পক্ষ নেয় ব্রিটেন ও ফ্রান্স। তিন মিত্রের চেয়ে দুই ইয়ার দুর্বল, তাই তাদের পক্ষ নেয় তুরস্ক। শান্তিকালে ব্যালান্স অব পাওয়ারের মতো যুদ্ধকালেও আরেক রকম ব্যালান্স অব পাওয়ার চাই। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। জিততে হলে আরো দোস্তের দরকার হয়। তিন শক্তির শিবিরে যোগ দেয় ইটালী, আমেরিকা, জাপান ও চীন। তেমনি, তিন ইয়ারের শিবিরে যোগ দেয় বুলগারিয়া। বলা বাহুল্য এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলোও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ভারতও তো একটা উপনিবেশ না হলেও ডিপেণ্ডেন্সী। মহাযুদ্ধ চার বছর ধরে গড়ায়। মাঝখানে ঘটে যায় অপ্রত্যাশিতভাবে রুশ বিপ্লব।

রুশ সম্রাটের পতন হয় সকলের আগে। তার পরে জার্মান সম্রাট তথা অস্ট্রিয়ান সম্রাটের। আরো পরে তুরস্কের সুলতান তথা ইসলামী দুনিয়ার খলিফার। মাত্র চারটি বছরে চারটি বনেদী সাম্রাজ্যের বিলোপ হলো, একটি সম্রাট তো সবংশে নিহত হলেন। আর তিনজন হলেন ফকির। অনেকগুলি দেশ স্বাধীনতা পায়। আরবরা স্বাধীনতা পেয়েও বহুধা বিভক্ত ও কার্যত পরবশ হয়। জারশাসিত রাশিয়া হয় সোভিয়েট রাশিয়া।

যুদ্ধশেষের ন'বছর বাদে আমি যখন ইউরোপে যাই ও দু'বছর থাকি তখন লক্ষ করি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে কেউ উন্মুখ নয়। সকলেই চায় শান্তি, স্থায়ী শান্তি। যেমন নেপোলিয়নের পতনের পরে। শান্তির জন্যে বৈঠক একটার পর একটা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কিন্তু ভের্সাইয়ের সন্ধির সর্তের ভিতরেই যুদ্ধের ভূত ছিল। ইটালী যা চেয়েছিল তা পায়নি। আরেকবার যুদ্ধ না করলে ও জয়ী না হলে আর কখনো পাবেও না। জার্মানী নানাভাবে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল। ফরাসীরা কড়া

হারে ক্ষতিপূরণ দাবি করেও দাবি না মেটা অবধি জার্মানীর কতক অংশ অধিকার করে বসে থাকে। তার উপনিবেশগুলোও বেহাত হয়।

উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ থাকলেও ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা জার্মানীতে যুদ্ধের জন্যে কায়িক বা মানসিক প্রস্তুতি দেখিনি। বিগত মহাযুদ্ধে ইংরেজ যুবকরা প্রথম বার কনসক্রিপ্ট হয়। তারা দ্বিতীয়বার কনসক্রিপ্ট হতে নারাজ। লক্ষ লক্ষ যুবক যুদ্ধে প্রাণ হারায়। তারা যে শূন্যতা রেখে যায় তার ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অবনতি বা অবক্ষয়। যুবতীদের তো বিবাহই হয় না। কাকে বিবাহ করবে! যাকে করত সে তো পরলোকে। তা হলে জনসংখ্যা বাড়বে কী করে? "নো মোর ওয়ার" আন্দোলন জোর কদমে চলে। মহিলারাই অগ্রণী। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রগতি হয়েছিল। সেটা নারীদের সকলেরই ভোট অধিকার লাভে ও অনেকের চাকরি প্রাপ্তিতে। আগে যেসব কাজ পুরুষদের একচেটে ছিল সেসব কাজে মেয়েদেরও দেখা যায়।

আমার ফিরে আসার পর নাৎসীদের জয়যাত্রা। এটা সম্ভব হলো বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্যেই। তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জার্মানী। হিটলার জার্মানীকে মন্দার হাত থেকে উদ্ধার করেন সামরিক প্রস্তুতির উদ্যোগ করে। ভের্সাইয়ের সন্ধি লঙ্ঘন করে জার্মানী তার সৈন্য সংখ্যা বাড়ায়। বহু বেকারের কাজ জোটে। তার সঙ্গে পাল্লা দেয় মারণাস্ত্র নির্মাণ। যুদ্ধসামগ্রী উৎপাদন। কলকারখানা পুরোদমে চলে। শ্রমিকরা কেউ বেকার থাকে না। সৈনিকদের ও শ্রমিকদের খোরাকের প্রয়োজন মেটাতে চাষের উৎপাদন বাড়ে। চাষীরা ফসল বিক্রি করে যথেষ্ট কামায়। হিটলার প্রমাণ করে দেন যে মন্দার প্রতিকার হচ্ছে সামরিক প্রস্তুতি। কোন্‌টা বেশি খারাপ? মন্দা না মন্দার প্রতিকার সামরিক প্রস্তুতি? বুদ্ধিমানরা বলেন, যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতিই শান্তির জন্যে প্রস্তুতি। যুদ্ধ যে বাধবেই এমন কী কথা আছে? ব্যালান্স অব পাওয়ার রক্ষিত হলে যুদ্ধ নাও বাধতে পারে। শান্তির খাতিরে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

হিটলারের আসল মতলব ঠাহর করতে পেরে ব্রিটেন আবার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়। কিন্তু সে যথেষ্ট প্রস্তুত নয় বলে মিউনিকে হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করে যুদ্ধকে পেছিয়ে দেন চেম্বারলেন। এক বছর বাদে যুদ্ধ যখন বাধে ব্রিটেন প্রস্তুত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দেখা গেল একদিকে সেই পুরাতন মিত্রশক্তিত্রয়—ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া। তাদের পেছনে সেই আমেরিকা ও চীন, কিন্তু জাপান নয়। অপর দিকে সেই জার্মানী ও সেই অস্ট্রিয়া, কিন্তু ইতিমধ্যে জার্মানীর সামিল। অথচ

সেই তুরস্ক নয়, সে নিরপেক্ষ। তার জায়গায় এসেছে ইটালী ও জাপান। এরা শিবির পরিবর্তন করেছে। এটাকে একই মহাযুদ্ধের সেকেণ্ড রাউণ্ড বললে অত্যুক্তি হবে না। এবারেও জার্মানী সেই একই ভুল করে। দুই ফ্রণ্টে লড়াই। যা করতে বিসমার্ক নিষেধ করেছিলেন। সুযোগ পেলে জার্মানী যে আরো এক রাউণ্ড লড়বে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? জার্মানদের বিশ্বাস কী? তাই বিজেতারা তাঁদের বিজয় নিষ্কণ্টক করার জন্যে জার্মানীকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। একভাগ থাকবে ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন দখলে। আরেক ভাগ রুশ দখলে। এঁদের ছত্রছায়ায় দুই স্বাধীন জার্মান রাষ্ট্র হবে। দখলদাররা পরে এক সময় পরস্পরের সঙ্গে সন্ধি করে দখল ছেড়ে দেবেন। কিন্তু অখণ্ড জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিতীয় এক ভের্সাই সন্ধি নৈব নৈব চ।

গোটা বার্লিনটাই রুশ দখলী এলাকায় পড়ে, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে বার্লিন নগরটাকেও বিজেতারা সবাই মিলে ভাগাভাগি করে নেন। না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত বার্লিন কী ছিল, কী হয়েছে। ভবিষ্যতে যদি আবার যুদ্ধ বাধে তো এই বার্লিনের ইস্যুতেই বাধবে, কারণ এই বন্দোবস্ত কখনো চিরস্থায়ী হতে পারে না। আপাতত দখলদার কোনো পক্ষই এক-পা এগোতেও পারছে না, এক-পা পেছোতেও পারছে না। তা হলে কি ওরা দুই পক্ষই আরো চল্লিশ বছর শান্তিতে সহ-অবস্থান করতে পারবে? না ইতিমধ্যে যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে পরস্পরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে? না ব্যালান্স অব পাওয়ার বজায় থাকছে না দেখে যুদ্ধ বাধিয়ে বসবে? ইউনাইটেড নেশনের তোয়াক্কা রাখবে না?

ইউনাইটেড নেশনসে এখন জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরা যুদ্ধ বিরোধী। তাঁরা চান নিরস্ত্রীকরণ। সব আগে পারমাণবিক মারণাস্ত্র বর্জন। কিন্তু পারমাণবিক মারণাস্ত্র বর্জন করলে তো প্রথাসিদ্ধ মারণাস্ত্র ব্যবহার করেই যুদ্ধ জিততে হবে। তাই যদি হয় তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন পশ্চিম জার্মানী ভেদ করে হলাণ্ড বেলজিয়াম বগলদাবা করে প্যারিসে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে তাকে সহজে হটানো যাবে না। নর্মাণ্ডির উপকূলে যত খুশি ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য নামাও, প্যারিস পর্যন্ত তারা এগোতে পারবে না। ব্রিটেন না হোক কণ্টিনেণ্টটা ক্রমে ক্রমে লাল হয়ে যাবে। সমুদ্রপথ ইঙ্গ-মার্কিন নেভীর অধিকারে থাকবে, সমুদ্রটাই হবে দুই পক্ষের মাঝখানে প্রাকৃতিক সীমান্ত। সেটা সোভিয়েট শক্তিরও শেষ সীমা।

কিন্তু এ রকম একটা বন্দোবস্তও চিরস্থায়ী হতে পারে না। সুতরাং যে পক্ষ

প্রথাগত বল পরীক্ষায় দুর্বল সে পক্ষ পারমাণবিক মারণাস্ত্রের প্রয়োগ করবেই। কিন্তু তাতেই বা কী ফল হবে? ঘরবাড়ি শহর-গ্রাম ধ্বংস হবে, মানুষও মরবে কোটি কোটি, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া কি পূর্ব জার্মানীর বা পূর্ব বার্লিনের এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেবে? না প্রতিপক্ষ পশ্চিম জার্মানীর ও পশ্চিম বার্লিনের এক ইঞ্চি জমি? যে যার গর্তে ঢুকে ওত পেতে থাকবে, শত্রুসেনা সীমান্ত ভেদ করলে গর্ত থেকে বেরিয়ে হাতাহাতি লড়াই করবে। কিংবা পেছন থেকে আক্রমণ করবে। পারমাণবিক মারণাস্ত্র প্রয়োগে কেউ কাউকে হারাতে পারবে না। ওটা একটা মোহ। তার খেসারত দিতে হবে কোটি কোটি নিরীহ মানুষকে। পোলাণ্ডের মতো জার্মানী বিভক্ত অবস্থায় দেড়শো বছরও থাকতে পারে।

এই দুর্ভাগ্য থেকে জার্মানদের পরিত্রাণ করতে পারে কেবল জার্মানরাই। তারা যদি আবার এক হতে চায় তবে যুদ্ধের জন্যে নয়, শান্তির জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। যুদ্ধে কেউ কাউকে হারাতে পারবে না। কিন্তু এখনো বহু নাৎসীভাবাপন্ন জার্মান আছে যারা আবার চায় যুদ্ধ। তারা সুনিশ্চিত যে যুদ্ধে তাদের জয় হবেই। যেহেতু আমেরিকা তাদের পক্ষে ও তার হাতে পারমাণবিক মারণাস্ত্র যত আছে সোভিয়েট রাশিয়ার হাতে তত নেই। ওদিকে পূর্ব জার্মানীতে রয়েছে ঘোর নাৎসীবিরোধী, ক্যাপিটালিস্টবিরোধী জার্মান। দুই জার্মানীর স্বেচ্ছায় মিলন নিকট ভবিষ্যতে হবার নয়। তাদের সম্পর্কটা এখন অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার মতো। ক্যাথলিক প্রটেস্টাণ্টের পুরনো ঝগড়ার জের এখনো মেটেনি। মতবাদ নিয়েছে ধর্মের স্থান। নাৎসী কমিউনিস্ট ক্যাথলিক প্রটেস্টাণ্টের মতোই জাতশত্রু। এখন ওরা যে যার মুরুব্বিকে পাকড়ে ধরেছে। একপক্ষ মার্কিনকে, অপর পক্ষ রুশকে। সন্ধি যদি হয় তবে সেটা মার্কিনে রুশে।

যাঁরা শান্তির জন্যে সক্রিয় তাঁদের মনে রাখতে হবে যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর যেমন ভের্সাই সন্ধি হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তেমন কিছু হয়নি। সেটা হওয়া উচিত ছিল। প্রত্যেক যুদ্ধের পরেই যুধ্যমান পক্ষদের মধ্যে সন্ধি হয়। সেইটেই নিয়ম। একমত হয়ে অস্ত্র হ্রাস করা বা বর্জন করা এক জিনিস, সন্ধি করা আরেক জিনিস। অস্ত্র হ্রাস, অস্ত্র বর্জনের প্রস্তাব অনেক বার হয়েছে, অনেক বার হবে। কিন্তু সন্ধির প্রস্তাব কি একবারও হয়েছে? শান্তি বৈঠক বসিয়ে সেটা হয়নি। ইউনাইটেড নেশনসের মাধ্যমেও সেটা হয়নি। প্রায় চল্লিশ বছর কেটে যেতে বসেছে, কিন্তু সন্ধির নামগন্ধ নেই। তার বদলে যা দেখা

যাচ্ছে তার নাম ঠাণ্ডা লড়াই। লড়ছেন মসীধারীরা। অসিধারীরা এগোতে ভরসা পাচ্ছেন না। ইতিহাসে এ রকম ঠাণ্ডা লড়াই বে-নজীর। রাজনীতিকরা গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছেন। বয়কট ইত্যাদিও ঘোষণা করছেন। আমেরিকানরা মস্কো অলিম্পিকে খেলতে যায়নি, রাশিয়ানরাও লস এঞ্জেলস অলিম্পিকে খেলতে যায়নি। লৌহ যবনিকা দু'পক্ষের লোককে পরস্পর সম্বন্ধে অন্ধকারে রেখেছে।

এটাও ক্রমে পরিষ্কার হচ্ছে যে অর্থনৈতিক মন্দার সেরা দাওয়াই মারণাস্ত্র নির্মাণ ও যুদ্ধোপকরণের উৎপাদন। হিটলার পথ প্রদর্শক। এসবের পেছনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় সেটা পুষিয়ে নিতে হলে সমাজ কল্যাণের জন্যে বরাদ্দ ছাঁটাই না করে উপায় কী? গরিবরা মরুক না চিকিৎসার অভাবে, তাদের ছেলেমেয়েরা হোক না অশিক্ষিত। তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা তো থাকছে।

আবার যদি মহাযুদ্ধ বাধে ভারত নিরপেক্ষ থাকবে। নিরপেক্ষ দেশের উপর কেউ পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ করবে না। আমরা বোমার আঘাতে মরব না। কিন্তু বাকুতে বা তাসখন্দে যে বোমা পড়বে তার তেজস্ক্রিয় ধোঁয়া ও ধুলো কি ভারতেও উড়ে আসবে না? সুতরাং আমরা আদৌ ভুগব না তা নয়। বেঁচে থাকলেও ভোগান্তি। হিরোশিমায় যারা জীবিত আছে তারা কঠিন ব্যাধিতে ভুগছে। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারও সম্ভব, কিন্তু কোথাও তার দৃষ্টান্ত আছে কি? যেটা শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে তৈরি হচ্ছে সেটাকে যুদ্ধের সময় মারণাস্ত্রে রূপান্তরিত করাও অসম্ভব নয়। অসামরিক এরোপ্লেনকেও সামরিক এরোপ্লেনে পরিণত করা যায়। মোটর গাড়ির কারখানাকেও ট্যাঙ্ক বানাবার কারখানায় পর্যবসিত করা যায়। দেশ যদি যুদ্ধে নামে।

১৯৮৪

হিরোশিমা

হিরোশিমার ও নাগাসাকির পারমাণবিক বোমার বর্ষণে লাখ দুয়েকের মতো মানুষ নিহত হয়। প্রায় সবাই অসামরিক বাল বৃদ্ধ বনিতা। আধ ঘণ্টার হুঁশিয়ারি পেলে অধিকাংশই গ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে বাঁচত। কিন্তু তা হলে তো পারমাণবিক বোমা বর্ষণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো না। উদ্দেশ্যটা ছিল জাপানকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা। বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে জাপানের হাইকমাণ্ড নারাজ ছিলেন। রাজী থাকলে পারমাণবিক বোমাবর্ষণের আবশ্যক হতো না। হিরোশিমা ও নাগাসাকির'পরেও হাইকমাণ্ডের মাথা নত হয় না। তাঁরা আরো কিছুকাল যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন, যদি না স্বয়ং সম্রাট হিরোহিতো বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের অপমানকর সিদ্ধান্তটা নিতেন। যুদ্ধ আরো কিছুদিন চালিয়ে জাপানের বিশেষ কোনো লাভ হতো না। সেই তো আত্মসমর্পণ করতেই হতো। তফাৎটা এই যে বিনা শর্তে না হয়ে সেটা হতো শর্তাধীন। শর্তগুলো কি বিজিতের অনুকূল হতো, না বিজেতার অনুকূল? সম্রাট বিশেষ কোনো প্রভেদ দেখতে পান না। মাথা হেঁট হলো এই যা তফাৎ। তিনি দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে দন্তে তৃণ ধারণ করেন।

সেকালে মৌর্য সম্রাট কলিঙ্গের যুদ্ধে এক লক্ষ মানুষের বিনাশ দেখে গভীরভাবে অনুতপ্ত হন। জয়ের আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হয়। তিনি ছিলেন চণ্ডাশোক, হলেন ধর্মাশোক। যুদ্ধবিগ্রহ বরাবরের জন্যে ত্যাগ করলেন। সাম্রাজ্যের প্রজাদের শান্তির বরাভয় দিলেন। সাম্রাজ্যের বাইরেও শান্তির জন্যে তৎপর হলেন।

একালে সে রকম একটা সুযোগ এসেছিল আমেরিকান প্রেসিডেন্টেরও জীবনে। হিরোশিমায় ও নাগাসাকিতে যা ঘটে তা কলিঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়।

কলিঙ্গের যুদ্ধে শুধু মানুষ মরেছিল, শহরকে শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়নি। সে যুদ্ধের চেয়ে এ যুদ্ধ অধিকতর নিষ্ঠুর, কারণ আহতদের সংখ্যা নিহতদের দ্বিগুণ। আর পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যারা নানা জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত তাদের দুর্ভোগ এই চল্লিশ বছরেও দূর হয়নি। পরন্তু তাদের আধি ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে তাদের সন্ততিতে। আরো কয় পুরুষ ধরে হবে তা কেউ বলতে পারে না। যারা বেঁচে বর্তে আছে তাদের ছেলেমেয়েরা চাকরি পায় না, চাকরি যদি-বা পায় বিয়ে করতে পারে না। পাছে তাদের রোগ তাদের সন্ততির শরীরে সংক্রামিত হয়।

প্রেসিডেন্ট ট্রুমান সম্রাট অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঘোষণা করতে পারতেন যে আমেরিকা আর কখনো পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না। তার নির্মাণ থেকে বিরত থাকবে। সে সময় একমাত্র আমেরিকার ভাণ্ডারেই পারমাণবিক অস্ত্র ছিল। সুতরাং আমেরিকার পক্ষে তেমন কোনো ঝুঁকি ছিল না। আবার লড়াই বাধলে সাধারণ বোমাই পড়ত, পারমাণবিক বোমা নয়। ফলাফল নির্ধারিত হতো সাধারণ অস্ত্র দিয়ে বল পরীক্ষার দ্বারা। কিন্তু পারমাণবিক বোমা যদি এক পক্ষের ভাণ্ডারে থাকে আর সেই পক্ষ সেটা ব্যবহার করতে চায় তা হলে অপর পক্ষ তা নির্মাণও করবে, ব্যবহারও করবে।

গত চল্লিশ বছরের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা ও শক্তি বহু গুণ বেড়ে গেছে। একটা বোমাই এখন একটা দেশকে বিধ্বস্ত করতে পারে। দু'পক্ষের বোমা পড়ে দুটো দেশ তো বিধ্বস্ত হবেই, তেজস্ক্রিয় পদার্থ পড়ে নিরপেক্ষ দেশও ধ্বংস হতে পারে। আর ধ্বংস হলে কেবল মানুষ নয়, পশুপাখি গাছপালা কীটপতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী ধ্বংস হবে। তাছাড়া পৃথিবীর উপর নেমে আসবে ধুলো বালি উড়ে এমন এক অন্ধকার রাত্রি যা সূর্যের আলোকে প্রবেশ করতে দেবে না দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। এর নাম পারমাণবিক শীতকাল। যদি বা কেউ বেঁচে থাকে সে সম্বৎসরব্যাপী শীতের প্রকোপে অসুস্থ হয়ে মারা যাবে।

যুদ্ধ ব্যাপারটা এককালে বীরত্বব্যঞ্জক ছিল। বীরত্ব প্রমাণ করার বহু সুযোগ মিলত। কিন্তু এখন যদি যুদ্ধ বাধে তবে জনাকয়েক ডানপিটে পাইলটই গোটা কয়েক পারমাণবিক বোমা ফেলে যুদ্ধ শেষ করে দিতে পারে। তারা নিজেরাও যে বাঁচবে তা নয়। তাদের বীরত্বের প্রশংসা করার জন্যেও আর কেউ বেঁচে থাকবে না। যুদ্ধ শেষ, মানুষ শেষ, বীরগাথা শেষ। একমাত্র তুলনা মহাভারতের মুষলপর্বের সঙ্গে। যদুবংশ নির্বংশ হয়। সমুদ্র এসে দ্বারকাকে মুছে দেয়।

এক্ষেত্রেও তাই হতে পারে। পারমাণবিক অস্ত্র বিনিময়ের ফলে সমুদ্রও যে উদ্বেল হবে না তা নয়। প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ দেখে ওপেনহাউমার সহস্র সূর্যের সঙ্গে তার তুলনা করেছিলেন। গীতার শ্লোক তাঁর মনে পড়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সভ্য মানুষের এমন দুর্মতি কেন হবে যে সে ভগবানের ভূমিকা গ্রহণ করে মহাপ্রলয় ঘটাবে? প্রলয়ের পরে নব সৃষ্টির ক্ষমতা কি তার আছে? একমাত্র ভগবানই সেটা পারেন। যার সৃষ্টির ক্ষমতা নেই, ধ্বংসের ক্ষমতা আছে, তাকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দেওয়া কি নিরাপদ? অথচ তাকে নিবৃত্ত করার জন্যে যে উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে সেটাও তো সেই প্রলয়ঙ্কর অস্ত্রের নিরলস নির্মাণ। তোমার হাতে যদি অ্যাটম বোম থাকে আমার হাতেও অ্যাটম বোম থাকবে। তোমার হাতে যদি হাইড্রোজেন বোম থাকে আমার হাতেও হাইড্রোজেন বোম থাকবে। তোমার হাতে যদি নিউট্রন বোম থাকে আমার হাতেও নিউট্রন বোম থাকবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইতিমধ্যে আমেরিকা, রাশিয়া ছাড়া আরো কয়েকটা নেশনের ভাণ্ডারে সেইসব অস্ত্র মজুত। যথা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন। আরো কয়েকটি নেশন প্রকাশ্যে বা গোপনে পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক হয়েছে। মুখে অবশ্য বলছে, পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারই আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার লক্ষ্য। এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের কোনো রকম নিদর্শনই আমরা কোথাও দেখতে পেলুম না। যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা এই যে শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে কল্পিত যন্ত্রও যুদ্ধকালে মারণ যন্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারে। মানুষের রাসায়নিক প্রতিভা এক মুঠো ধুলোকে এক মুঠো সোনায় রূপান্তরিত করতে না পারুক এক মুঠো ঘাতক বস্তুতে রূপান্তরিত করতে পারে। কমার্শিয়াল প্লেন হয়ে যাবে ওয়ার প্লেন। মোটর নির্মাণের কারখানা বনে যাবে ট্যাঙ্ক নির্মাণের কারখানা।

বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরির উপরে সবুজ আস্তরণ। সেখানে লোকে পরম নির্ভয়ে চাষ করে। বাস করে। বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু হঠাৎ একদিন বিসুবিয়াস সক্রিয় হয়। লাভাবর্ষণে মানুষের সর্বনাশ ঘটে। আজকের দিনের পৃথিবীও তেমনি বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরি। পারমাণবিক বিস্ফোরণে এর অধিবাসীরা সমূলে বিনষ্ট হতে পারে। সকলেই জানে, অথচ অবশ্যম্ভাবী লাভাবর্ষণকে রুখতে পারছে না। যে কোনো দিন যে কোনো একটা ক্ষুদ্র ঘটনাকে উপলক্ষ করে মহাযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। যেমন বেধেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে সেরাজেভোতে অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকে উপলক্ষ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের বহু পূর্বেই টলস্টয় প্রভৃতি

মনীষীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিলেন যে মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতার নিশ্চিত পরিণাম সেইসব মারণাস্ত্র দিয়ে পরস্পরের বিনষ্টি। কিন্তু তখনকার দিনের বুদ্ধিমানদের যুক্তি হলো উভয় পক্ষে ব্যালান্স অব পাওয়ার থাকলে কোনো পক্ষই যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে না। অকাট্য যুক্তি। মহাশক্তিরা কেউ যুদ্ধ বাধিয়েও দেয়নি। বেধে গেল জনাকয়েক সার্বিয়ান সন্ত্রাসবাদীর অবিমৃষ্যকারিতায়। যুদ্ধের জন্যে সেজে থাকলে যুদ্ধ হবেই। অস্ত্রসজ্জার ভিতরেই যুদ্ধের মূল নিহিত রয়েছে।

আজকের দিনেও একই যুক্তি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। যুদ্ধের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকাই যুদ্ধ নিবারণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অধিকাংশ নাগরিক মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, আমরা যদি প্রস্তুত না থাকি তবে আমরাই হেরে যাব। অতএব সর্বস্ব খরচ করে মারণাস্ত্র বানাও। সবচেয়ে শক্তিশালী মারণাস্ত্র। যার সাহায্যে আমরাই জিতব। এই মোহ নাৎসীদেরও ছিল। জাপানীদেরও ছিল। জার্মানরা কেবল যে হেরে গেল তা নয়, দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। আর জাপানীরাও দ্বিধাবিভক্ত হতে পারত, যদি যুদ্ধ আরো একমাস কি দু'মাস স্থায়ী হতো। রাশিয়া ইতিমধ্যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়ে জাপানের উত্তরের দ্বীপটা দখল করে নিত। আমেরিকার পারমাণবিক বোমাবর্ষণের তাড়াহুড়ার কারণ নাকি তাই। আর জাপান সম্রাটের সহসা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণেরও। তিনিও চাননি যে জাপান জার্মানীর মত বিভক্ত হয়। যুদ্ধ হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়ায় জাপানের ক্ষতি যা হয়েছে লাভ হয়েছে তার চেয়ে বেশী। সেইজন্যে জাপানীদের মনে এখন মার্কিনবিদ্বেষ নেই। মস্ত বড়ো একটা লাভ অতি ভয়ঙ্কর সামুরাই কুলের পতন! ইতিহাসের মঞ্চ থেকে ওরা বরাবরের মতো বিদায় নিয়েছে। সাধারণ জাপানী একটা মহৎ ভয় থেকে মুক্ত। এটাও এক প্রকার মুক্তি।

জাপান তার অর্থ পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের খাতে অপচয় করেনি। সেটা শিল্পে বাণিজ্যে ও কৃষিতে নিয়োগ করে পৃথিবীর তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় আমেরিকাকেও হটিয়ে দিতে যাচ্ছে। রাশিয়াকেও। ব্রিটেন ফ্রান্স তার তুলনায় পশ্চাৎপদ। চীনের তো কথাই নেই! তবে পশ্চিম জার্মানী তার সমকক্ষ হতে পারে। সেও মারণাস্ত্র নির্মাণে অর্থের অপচয় করেনি। তবে সে নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের সভ্য। নাটোর চাপে তাকেও সামরিক খাতে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। এ নিয়ে জার্মানদের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ। আবার যুদ্ধ বাধলে তারাই তো হবে দাবাখেলার বোড়ে।

তাদের দেশ আবার ধ্বংসস্তূপ হবে। অথচ যুদ্ধের সাধ এখনো মেটেনি প্রচ্ছন্ন নাৎসীদের। লড়কে লেঙ্গে পূর্ব জার্মানী।

ওপারে ওরাও তো বলতে পারত, লড়কে লেঙ্গে পশ্চিম জার্মানী। কিন্তু ওকথা বলছে না। ওরা হীনবল বলে নয়, ওদেরও যথেষ্ট শক্তি আছে। কিন্তু ওরা জানে যে তৃতীয় মহাযুদ্ধে কোনো পক্ষই জিতবে না, কোনো পক্ষই হারবে না, কোনো পক্ষই আত্মসমর্পণ করবে না, উভয় পক্ষই লড়তে লড়তে মরে ভূত হয়ে যাবে। তাদের পারমাণবিক অস্ত্রই তাদের নিশ্চিহ্ন করবে। সেটা হলো পারস্পরিক আত্মহত্যার অস্ত্র। ফরাসী বিপ্লবের সময় অভিজাতদের এক সুইসাইড ক্লাব ছিল। মেম্বররা মুখোস পরে একই মুহূর্তে পরস্পরকে গুলী করে মারতেন। যাতে বিপ্লবীদের হাতে মরতে না হয়। একালে আমরা সেই সুইসাইড ক্লাবের নব জন্ম দেখছি। পাঁচটি নেশন মিলে এক সুইসাইড ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই ক্লাবে প্রবেশ পাওয়া অপরের পক্ষে বারণ। তা সত্ত্বেও কয়েকটি প্রবেশপ্রার্থীর চেষ্টার ত্রুটি নেই। ইসরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, আর্জেনটাইনা এরাও পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করছে বলে শোনা যায়। এমন কী আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তানও নাকি সুইসাইডের পথে অনেকদূর এগিয়ে রয়েছে। আমাদেরও একটা নিউক্লিয়ার লবি আছে। তার কাজ হলো জনসাধারণকে বোঝানো যে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে অবহেলা করলে পাকিস্তানের বোমায় নিশ্চিত মরণ। কিন্তু ভারতও যদি পারমাণবিক অস্ত্র বানায় তা হলে কি মরণ থেকে অব্যাহতি, না মরণের দিকে অগ্রগতি? কে এমন অভয় দিতে পারে যে পাকিস্তান আপনি মরবে জেনেও ভারতের উপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করবে না?

পারমাণবিক অস্ত্রের বিপদ এইখানে যে ক্ষুদ্রতর শক্তিও আপনি মরে বৃহত্তর শক্তিকে মরণকামড় দিয়ে যেতে পারে। লেবাননে আমরা শিয়া আত্মঘাতীদের পরাক্রম দেখে অবাক হচ্ছি। তাদের আত্মহত্যার দাপটে ইসরায়েলকে লেবানন ত্যাগ করতে হয়েছে। তাদের দাপটে মার্কিনদেরও কম ক্ষতি হয়নি। এটা একটা নতুন রণকৌশল। তবে আত্মঘাতীরা কিছু ধরে রাখতে পারে না। তারা চরম ত্যাগ করতে পারে ও চরম ক্ষতি করতে পারে, এই পর্যন্ত। ভাবী মহাযুদ্ধেও সুইসাইড ক্লাবের মেম্বররা মাটির উপর বেশী দূর অগ্রসর হতে পারবেন বলে মনে হয় না। মাটি যার দখলে আছে তার দখলেই থাকবে। পাকিস্তান গোটা কয়েক শহর উড়িয়ে দিতে পারবে, কিন্তু মাটি এক ইঞ্চি গ্রাস করতে পারবে না। অপর পক্ষে ভারতও গোটা কয়েক শহর উড়িয়ে দিতে পারবে, কিন্তু মাটি এক ইঞ্চি

দখল করতে পারবে না। যদি করে সেটা পারমাণবিক অস্ত্রের জোরে নয়, সাধারণ অস্ত্রের জোরে। যে বিলাস আমেরিকার মতো ধনী দেশের সাজে সে বিলাস ভারতের মতো গরিব দেশের সাজে না। গরিব তাতে আরো গরিব হবে। চিরকাল পড়ে পড়ে সহ্য করবে না। বাকীটা অনুমানের উপর ছেড়ে দেওয়া যাক।

যুদ্ধের কথা না ভেবে শান্তির কথাই ভাবতে হবে। অস্ত্রশস্ত্রের আস্ফালন ছেড়ে শান্তি বৈঠকে মিলিত হতে হবে। নেগোশিয়েসনস চালাতে হবে। দরাদরি করতে হবে। তাতে তেমন রোমাঞ্চ নেই। যুদ্ধের মতো শান্তি রোমাঞ্চকর নয়। তবু শান্তিরই প্রয়োজন বেশী। সে প্রয়োজন ক্রমশ আরো বাড়বে। বার বার ব্যর্থ হলেও শান্তির প্রচেষ্টাই শ্রেয়। বিধাতার আশীর্বাদধন্য তাঁরাই যাঁরা শান্তি স্থাপন করেন। ভারত হোক তাঁদেরই একজন। স্বাধীনতার তাৎপর্যই হচ্ছে যুদ্ধে যোগ না দেবার স্বাধীনতা।

শান্তির অর্থ কী। যুগে যুগে তার অর্থ তলোয়ারকে ভেঙে লাঙল বানানো। উৎসাদন ছেড়ে উৎপাদন। তার সঙ্গে যোগ করা যাক বণ্টন। একালের মানুষ চায় সুষ্ঠুভাবে বণ্টন। যাতে সকলেই প্রয়োজনমতো ভোগ্য সামগ্রী পায়। উৎপাদনে ক্যাপিটালিস্ট কমিউনিস্ট কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। বণ্টনের বেলাই কম বেশী। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ না হলে এরা যে এক হাত লড়বেই এটা একরকম সুনিশ্চিত। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার এই লাস্ট রাউণ্ডটা দেখতে দুই পক্ষের দর্শকরাই উদগ্রীব। যেমন ছিল সেকেণ্ড রাউণ্ড দেখার জন্যে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। তখনকার খেলাটা ফাসিস্ট বনাম অ্যান্টিফাসিষ্ট এই দুই টীমের মধ্যে। সেবার এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। চার্চিল স্টালিন ভাই ভাই। রুজভেল্টও ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে হাত মেলান। কে যে কার সাহায্যে যুদ্ধে জয়ী হয় তা নিয়ে বিতর্ক আজ অবধি শোনা যায়। রুশদের মতে তারা মদত না দিলে ইঙ্গ-মার্কিনরা নাৎসীদের হারাতে পারত না। ইঙ্গ-মার্কিনদের মতে তারা মদত না দিলে রুশরা নাৎসীদের উপর জয়ী হতে পারত না। এ বিতর্ক আরো কতকাল চলবে কে জানে? চলতে চলতে একদিন হয়তো লাস্ট রাউণ্ড ডেকে আনবে। সেটাই কাপ ফাইনাল।

আমার নিজের বিশ্বাস হয় না যে ভারত শুধু দর্শকমাত্র থাকবে। আগের দু'বার নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি। জড়িয়ে পড়েছে। এবার যদি নিরপেক্ষ থাকতে পারে তবে হয়তো শান্তির জন্যে অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যেতে পারবে। সেটাই হবে ভারতের গৌরবপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু যেটা সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর সেটাই

যে সর্বাপেক্ষা সম্ভবপর বিশ্বের ইতিহাস এ ধারণা সমর্থন করে না। যে দেশের তিন দিকে সমুদ্র সে দেশ তিন দিক থেকেই আক্রান্ত হতে পারে পাশ্চাত্ত্য শক্তিদের দ্বারা, যদি না তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। উত্তর থেকে আক্রমণ করতে পারত চীন, কিন্তু তার নিজেরই পূর্বদিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয়, যদি সে রুশ পক্ষে যোগ দেয়। রুশ পক্ষে যোগ না দিলেও তার বিপদ। উত্তর থেকে ও পশ্চিম থেকে রুশ আক্রমণের মুখে পড়বে।

কোন্ পক্ষ জিতবে আর কোন্ পক্ষ হারবে তা নিয়ে আমি চিন্তান্বিত নই। আমার ভাবনা ভারতকে নিয়ে। রাশিয়ার বিপক্ষে দাঁড়ালে সোভিয়েট সেনা আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে পাকিস্তানে ঢুকবেই। আর পাকিস্তানে ঢুকলে ভারতে ঢুকতে কতক্ষণ! দিল্লীতে পৌঁছতে কতক্ষণ। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ভারতের পক্ষে হবে মূঢ়তার নামান্তর। অচিরেই দেখতে পাওয়া যাবে ভারত আবার দু'ভাগ হয়ে গেছে। একভাগ ইঙ্গ-মার্কিনের দখলে, অপর ভাগ সোভিয়েটের দখলে। বলা বাহুল্য ইণ্ডিয়ান আর্মিও দু'ভাগ হয়ে যাবে। দু'দিক সামলাতে পারবে না। দেশ আবার কবে জোড়া লাগবে তা গণনা করে বলা গণৎকারেরও সাধ্য নয়।

এই সম্ভবপর বিপত্তি নিবারণ করাই বিজ্ঞতা। একথা মনে রেখেই আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। যাতে কোনো শিবিরেই ভিড়ে না যাই। কোনো পক্ষকেই শত্রু না করি। আর ওই যে কলিযুগের মুষল, যার নাম পারমাণবিক অস্ত্র, তার মায়ায় মুগ্ধ না হই। মায়ামুগ্ধরা মনে মনে জোটবন্দী হয়ে রয়েছেন। কিংবা পাকিস্তানের প্ররোচনায় জোটবন্দী হবেন। পাকিস্তানের বোমার বদলা বোমা ফেলে সিন্ধু সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলা মহা অপরাধ।

পাকিস্তান নামটা ভুইফোঁড়, কিন্তু দেশটা অতি প্রাচীন। সেখানে কেবল যে সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি তা নয়, বৈদিক সভ্যতারও আদি পর্ব। গ্রীকরাও সেখানে আসে ও গান্ধার ভাস্কর্যের উপর ছাপ রেখে যায়। বহু শতক ধরে সেটা বৌদ্ধ প্রভাবাধীন ভূমি ছিল। তক্ষশীলা যার কেন্দ্র। শক হূন কুশানরা এসে সেইখানেই লীন হয়। পাকিস্তানের সর্বত্র প্রাচীন ভারতের স্তরের পর স্তর। যেখানেই পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ করো সেখানেই তোমার নিজের অতীত, নিজের ঐতিহ্য, নিজের স্মৃতি। মানুষ মরলে মানুষ জন্মাবে, কিন্তু হরপ্পা বা মোহেনজোদরো ধ্বংস হলে পরে আবার গড়ে উঠবে না। উত্তরপুরুষকে তুমি তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।

একই কথা খাটে ভারত সম্বন্ধেও। পাকিস্তান যেখানেই বোমা নিক্ষেপ করবে সেখানেই সুলতানী আমলের অথবা মোগল আমলের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, স্মৃতি। ভারতের মুসলমানদের গর্ব ও গৌরব। মানুষ মরলে মানুষ আবার জন্মাবে, কিন্তু মুসলমান তার উত্তরাধিকার হারাবে। সেই সঙ্গে হিন্দুও। কারণ সেসব এখন সকলের যৌথ উত্তরাধিকার। এই পারমাণবিক পাগলামি থেকে পাকিস্তানকে নিবৃত্ত করতে হলে ভারতকেই দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। কারণ ভারতই প্রথমে পোখরানে পারমাণবিক শক্তি পরীক্ষা করে। হয়তো চীনের জুজুর ভয় থেকে তার উদ্ভব। কিন্তু পাকিস্তান ধরে নেয় সেটা তার জন্যেই উদ্দিষ্ট। ছোটরাই বড়োদের ভয় করে। ভারত চীনের চেয়ে ছোট। পাকিস্তান ভারতের চেয়ে ছোট। এর পর পাকিস্তানের ভয়ে আফগানিস্থানও পারমাণবিক অস্ত্র বানাবে। পাকিস্তানী বোমা যে আফগানিস্থানের উপর পড়বে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? সন্ধি হয়েছে কি?

বাস্তবিক, কার বোমা যে কার উপরে পড়বে তা কি কেউ বলতে পারে? পারমাণবিক বোমা যখন প্রথমে পরিকল্পিত হয় তখন তার লক্ষ্য ছিল নাৎসী জার্মানী, যেখানে ইহুদীদের উৎসাদন করা হচ্ছিল। কিন্তু সেখানে না পড়ে সেটা পড়ল জাপানের উপর, যেখানে ইহুদীই ছিল না। মার্কিন পারমাণবিক বোমা যদিও তৈরি হচ্ছে রাশিয়ার উপর নিক্ষেপের মানসে তবু প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের জবানীতেই আমরা শুনছি তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল ভারত। ভারত যাতে পাকিস্তানকে ভেঙে না দেয়। আশ্চর্য হওয়ার কী আছে মার্কিন বোমা যদি একদিন ইসরায়েলকে রক্ষা করতে আরবদের উপর বর্ষিত হয়?

তবে যতদূর অনুমান করতে পারি প্রথম নিক্ষেপটি রাশিয়ার জন্যেই উদ্দিষ্ট। এক মিনিটের মধ্যেই রাশিয়া তার বদলা নেবে। সব আগে থেকে তৈরি। কাউকে কিছু ভাববার সময় দেওয়া হবে না। কিন্তু কারো জানা নেই কার বোমাটা কোন্‌খানে পড়বে। এমনও তো হতে পারে যে মস্কোর বদলা নিউ ইয়র্ক না হয়ে রোম, লেনিনগ্রাডের বদলা ওয়াশিংটন না হয়ে প্যারিস, কিয়েভের বদলা শিকাগো না হয়ে লণ্ডন। এসব শহরের ধ্বংস মানে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই ধ্বংস। অপূরণীয় ক্ষতি। নিউ ইয়র্ক আবার গড়ে উঠতে পারে, রোম আর কখনো নয়। ওয়াশিংটন আবার গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু প্যারিস আর কখনো নয়। শিকাগো আবার গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু লণ্ডন আর কখনো নয়। এইখানেই ট্রাজেডী।

১৯৮৫

অশান্ত পাঞ্জাব

এমন যে কখনো হতে পারে আমরা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। পাঞ্জাব জুড়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলেছে, মরছে যারা তারা নিরঙ্কারী শিখ বা হিন্দু। মারছে যারা তারা অকালী শিখ বা আরো উগ্র খলিস্তানপন্থী শিখ। রাজ্যের পুলিশ থামাতে পারছে না, কেন্দ্রের পুলিশ থামাতে পারছে না, পুলিশকেই মেরে পার পেয়ে যাচ্ছে, দুর্গ বানিয়েছে ও অস্ত্রাগার করেছে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের নিরাপদ আশ্রয়ে। যেখানে পুলিশের ও মিলিটারির প্রবেশ নিষেধ।

উগ্রপন্থীদের তো সাত খুন মাফ, অকালী দলও সঙ্গে সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের নয়া কর্মপন্থা রাজ্য থেকে শস্য চালান হতে না দেওয়া। শস্য জমুক আর পচুক, অন্যান্য রাজ্যের লোক খেতে না পেয়ে মরুক। ক্ষেত খামারে কাজ করার জন্যে বিহার থেকে উত্তর প্রদেশ থেকে যেসব দিনমজুর এসেছে তাদের তাড়াতে হবে। চাষের ক্ষতি হয় হোক। যেন তারা ভারতীয় নাগরিকই নয়, তাদের নাগরিক অধিকারই নেই। অথচ ভারতের সর্বত্র পাঞ্জাবী শিখদের নাগরিক অধিকার থাকবে।

ভারত সরকার প্রত্যাশা করেছিলেন যে অকালী শিখদের চক্ষুশূল দরবারা সিং সরকারকে সরালে শান্তি সুগম হবে। তাই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাতেও অবস্থার উন্নতি হলো না, বরং আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে মনে হলো। তখন বাধ্য হয়ে মিলিটারি পাঠাতে হলো, কিন্তু মিলিটারিই বা কী করতে পারে যদি একদল জঙ্গী শিখ স্বর্ণমন্দিরে তাদের নিরাপদ ঘাঁটি বানায় ও সেখান থেকে বাইরে এসে হানা দিয়ে আবার সেইখানেই পালায়? ঘাঁটি দখল করা একটা

মিলিটারি নেসেসিটি। না করলে মিলিটারিকেও রাজ্যের পুলিশ তথা কেন্দ্রের পুলিশের মতো ব্যর্থ হতে হবে। পৃথিবীতে এমন কোন গভর্ণমেণ্ট আছে যে আর একটা সমান্তরাল গভর্ণমেণ্ট চলতে দেবে? এমন কোন্ গির্জা বা মসজিদ বা মন্দির আছে যেখানে কোনো অবস্থাতেই পুলিশ বা মিলিটারি প্রবেশ করতে পারবে না, খানাতল্লাসি বা ধরপাকড় করতে পারবে না? খ্রীস্টীয় চার্চ আগেকার দিনে এ রকম দাবী করত, কিন্তু ইতিমধ্যে তার একটা ফয়সালা হয়েছে। অপরাধীদের সে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে অপরাধ চালিয়ে যেতে দেয় না। পুলিশের হাতেই সমর্পণ করে। মুসলমানদের পবিত্রতম মসজিদ কাবা শরিফে যেসব সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি করেছিল তাদের উচ্ছেদ করার জন্যে সৌদী আরব সরকার সৈন্য পাঠান। তারা নিহত হয়।

উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে উভয় পক্ষেই বহুলোক হতাহত হয়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন সন্ত ভিন্দ্রানওয়ালে! ইনিই উগ্রপন্থীদের সর্বাধিনায়ক। খলিস্থান সম্ভব হলে ইনিই হতেন তার আয়াতোল্লা খোমেইনী। এঁর হিন্দুবিদ্বেষ শিখ ইতিহাসে অভাবনীয়। এর হুকুমে বহু হিন্দুর প্রাণ গেছে। তাই ইনি সদলবলে নিহত হয়েছেন শুনে রাজ্যের হিন্দুরা নাকি মিষ্টান্ন বিতরণ করে। এঁদের আশ্রয়স্থল অকাল তখ্‌ত বহু পরিমাণে বিনষ্ট হয়। সমগ্র শিখ সমাজ শোকে মুহ্যমান। অকাল তখ্‌তে সারানোর জন্যে সরকার সচেষ্ট। দায়িত্ব নিয়েছেন যিনি তিনিও শিখ। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শিখ তাঁর ডাকে সাড়া দিলেও আরো লক্ষ লক্ষ শিখ বিপক্ষে। অকাল তখ্‌তে সংরক্ষিত ছিল চার পাঁচ শতাব্দীর পুরাতন পুঁথিপত্র, গুরুদের হস্তলিপি। সব পুড়ে ছাই। পুনরুদ্ধার অসম্ভব।

ব্যাপার যে এতদূর গড়াবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার হৃদয় এখন শিখদের সঙ্গে। শিখরা এক ধার থেকে সকলেই বজ্রাহত, বিচলিত ও ক্ষুব্ধ। শুধু যে অকালীরা তা নয়। রক্ষা এই যে হরিমন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অক্ষত রয়েছে। দৈনিক উপাসনায় ব্যাঘাত ঘটেনি। কর্তৃপক্ষ সেদিকে হুঁশিয়ার ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল উগ্রপন্থীদের সমূলে উচ্ছেদ করা। তারা যদি বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করত তাহলে তারাও বাঁচত, অকাল তখ্‌তের গায়ে আঁচড়টিও লাগত না, কিন্তু তাদের প্রস্তুতিটাই যুদ্ধবিগ্রহের। সেটা এমন এক কেন্দ্র থেকে যেটা অপর পক্ষের সৈন্যদের নাগালের বাইরে। ধর্মস্থানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগানোর সুযোগ না থাকলে তারাও ভারত সরকারের সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে লড়তে সাহস পেতো না। সেইজন্যে যেসব প্রশ্ন মনে জাগছে তার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন হলো,

কোনো সভ্যদেশে কি ধর্মস্থানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়? যদি না হয় তো এদেশেই বা হতে দেওয়া হবে কেন? অকালীরা যদি রাজনৈতিক আন্দোলন করতে চায় তো বাইরে এসে করুক। আর সবাই যেমন করছে। এতো বড়ো যে স্বাধীনতা আন্দোলন তা হিন্দু মন্দির বা মঠবাড়ী থেকে হয়নি। হয়েছে গান্ধীজীর আশ্রম থেকে। সেটা ধর্মস্থান নয়। সেখানে কোনো দেবদেবী ছিল না, তাঁদের পূজা অর্চনাও হতো না। যেটা হতো সেটা সার্বজনীন উপাসনা। সব ধর্মের লোক যোগ দিত। গান্ধীজীর আশ্রমের বাইরে আন্দোলনের বহু কেন্দ্র ছিল। কোনোটাই ধর্মস্থান নয়। আন্দোলনটা ধর্মনিরপেক্ষ। তবে ধর্মবর্জিত নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতারা কেন শিখ সন্ত? উগ্রপন্থীই হোন আর নরমপন্থীই হোন সকলেই এক একজন সন্ত। যেমন ভিন্দ্রানওয়ালে তেমনি লঙ্গোয়াল। এখন দেখছি হরিমন্দিরের পুরোহিতরাও নেতৃত্ব করতে উদ্যত। আন্দোলনটা যদি ধর্মনির্বিশেষে রাজ্যের অধিবাসীদের স্বার্থেই হতো তবে হিন্দুরাও এতে যোগ দিত, অন্তত তাদের জন্যে দরজা খোলা থাকত। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এটা শিখদেরই সাম্প্রদায়িক স্বার্থে। সম্প্রদায়কেই বলা হচ্ছে নেশন। অবিকল মুসলিম লীগের মতোই উক্তি। ওঁদের মতে মুসলমানরা একটা নেশন। ওঁরা দাবী করেছিলেন মুসলিম নেশনের জন্যে তাঁদের হোমল্যাণ্ড। এঁরা দাবী করছেন শিখ নেশনের জন্যে এঁদের হোমল্যাণ্ড। আমার হাতের কাছে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত 'ট্রান্সফার অভ্ পাওয়ার' নামক গ্রন্থ আছে। তাতে ক্যাবিনেট মিশনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ক্যাবিনেট মিশনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শিখ নেতারা বলেন তাঁরা চান সংযুক্ত ভারত, তাতেই তাঁরা তাঁদের সংখ্যালঘুর অধিকার পাবেন। কিন্তু ভারত যদি ভাগ হয় তবে তাঁরা পাকিস্তানে যাবেন না, হিন্দুস্থানেও যাবেন না, থাকবেন শিখিস্থানে বা খলিস্থানে। কিন্তু কোথায় সেই শিখিস্থান বা খলিস্থান হবে? এমন জেলা কি একটিও আছে যেখানে শিখদের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশের বেশী? জেরার জবাবে তাঁরা বলেন, না, তেমন জেলা একটিও নেই, লোক বিনিময়ের দ্বারা কয়েকটি জেলাকে শিখপ্রধান জেলায় পরিণত করতে হবে। ব্রিটিশ কর্তারা তাতে নারাজ হন। শিখদের সামনে তিনটি নয়, দুটি বিকল্প রাখা হয়। হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান। দুটির একটিকে বেছে নিতে হবে। তাঁরা হিন্দুস্থান বেছে নেন। হিন্দুরা তাঁদের ডাকেনি, বাধ্য করেনি। তাঁরা স্বেচ্ছায় চোখ কান খোলা রেখে হিন্দুস্থানেই যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

একবার হিন্দুস্থানে যোগ দেবার পর আবার দীর্ঘকাল পরে বিচ্ছেদের জন্যে আন্দোলন করা চলে না।

কিন্তু এই সাঁইত্রিশ বছরে দাবীর মূলে একটা শক্ত বনিয়াদ তৈরি হয়েছে। সেটা কয়েকটা জেলায় শিখ সংখ্যাধিক্য। সেই সংখ্যাধিক্যের অস্তিত্ব থাকলে পার্টিশনের সময়েই শিখিস্থান বা খলিস্থান সম্ভব হতো। মুসলমানদের মতো শিখদের উপরেও ইংরেজদের স্নেহদৃষ্টি ছিল। তা বলে তাঁরা তাঁদের বেয়োনেটের জোরে লোকবিনিময় ঘটাতে রাজী হতেন না। তাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বাধা দিত। কিন্তু তাঁদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই আপনা থেকে বা মারের চোটে হিন্দু মুসলমানের লোকবিনিময় ঘটে যায়। একই কালে শিখ মুসলমানেরও। পশ্চিম পাঞ্জাব হিন্দুশূন্য তথা শিখশূন্য হয়ে যায়। পূর্ব পাঞ্জাব মুসলিমশূন্য হয়ে যায়। এটা কি নেতারা কেউ চেয়েছিলেন ? না, তাঁরাও ভাবতে পারেননি। না জিন্না, না নেহরু, না বলদেও সিং। তবে এর পেছনে জনাকয়েক প্রতিদ্বন্দ্বী নেতার হাত ছিল বলে শোনা যায়। তার চেয়ে বড়ো কথা যারা পালিয়ে আসে বা যায় তারা যেখানে ছিল সেখানে ভবিষ্যৎ নেই এটা অনুমান করেই অমন সিদ্ধান্ত নেয়। ইউরোপের ইতিহাসে এর বহু নজীর আছে। কেবল মধ্যযুগেই নয়, বর্তমান যুগেও। সেকালে তার মূলে ছিল ধর্মের জুলুম। একালে মতবাদের জুলুম। কিংবা আর্যামির জুলুম। ইহুদীরাও প্যালেস্টাইনে গিয়ে আরবদের তাড়িয়েছে রেসিয়াল সংখ্যাধিক্য স্থাপনেব জন্যে। আমাদের ধারণা ছিল ভারতের ইতিহাসে অমন কোনো অন্যায় ঘটবে না। আমাদের আশা ছিল যে যার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বাড়ীঘর ফিরে পাবে, প্রতিবেশীরা অভয় দেবে, সরকারে সরকারে মিটমাট হবে। দুঃখের বিষয় উল্টোরথের দেখা নেই। কেউ ফিরে যায়নি বা আসেনি।

উল্টে যেটা দেখা গেল সেটা নতুন বাসভূমিটাকেই শিখ সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে পাঞ্জাবী ভাষাভিত্তিক রাজ্যে পরিণত করা, তার জন্যে হিন্দীভাষী হরিয়ানাকে বাদ দেওয়া, একটি না দুটি জেলাকে হিমাচল প্রদেশভুক্ত করা। তা সত্ত্বেও শতকরা আটচল্লিশ জন হিন্দীভাষী থেকে গেল পুনর্গঠিত পাঞ্জাবে। তারাও পাঞ্জাবী, অথচ পাঞ্জাবীভাষী বলে পরিচয় দেয় না, নিজের মাতৃভাষাকে ছেড়ে হিন্দীভাষাকে বরণ করে। শিখদের চোখে এটা একটা অমার্জনীয় অপরাধ। যাদের সঙ্গে ধর্মের বন্ধন ছিল না তাদের সঙ্গে ছিল ভাষার বন্ধন। সে বন্ধনও যদি কেউ কাটিয়ে যায় তবে সে তো স্বেচ্ছায় পর হয়ে গেল। মজা হচ্ছে, বাড়ীতে সকলেই পাঞ্জাবী

ভাষায় কথা বলে, কিন্তু বাইরে তাদেরই শতকরা আটচল্লিশ জন হিন্দীভাষী। সমস্যাটাকে আরো জটিল করেছে গুরুমুখী লিপি বনাম দেবনাগরী লিপি। শিখরা গুরুমুখী লিপিতে লেখে ও পড়ে। হিন্দুরা দেবনাগরী লিপিতে লেখে ও পড়ে। আগেকার দিনে শিক্ষিত হিন্দু শিখ মুসলমান সকলেই উর্দুতে লিখত ও পড়ত। সেটা এখন কেবল পাকিস্তানেরই রীতি।

এই যে স্বখাত সলিল এর থেকে কে এদের বাঁচাবে? আক্ষরিক অর্থে হিন্দু শিখ ভাই ভাই বহু পরিবারে। আমার ছেলেবেলায় আমার জন্মস্থানে এক পাঞ্জাবী ফরেস্ট অফিসার ছিলেন, নাম পৃথ্বীচাঁদ। তিনি হিন্দু। কিন্তু তাঁর স্ত্রী শিখ। তাঁদের পুত্র বলদেও সিং আমাদের স্কুলে পড়ত, আমাদের সঙ্গে খেলত। সে শিখ। ধর্ম আলাদা হলেও সাধারণত উভয়পক্ষের কাস্ট এক। একই কাস্ট সিস্টেম শিখ আর হিন্দুকে বেঁধে রেখেছে, তাই দুই সম্প্রদায়েই তফসিলী জাত আছে। সংবিধানে হিন্দু ও শিখকে বন্ধনীভুক্ত করার কারণও তাই।

গুরু গোবিন্দের পূর্বেও আরো নয়জন গুরু ছিলেন। তাঁরা কেউ সিংহ পদবী ধারণ করেননি। কেশ, কঙ্গী, কঙ্কণ, কচ্ছ ও কৃপাণ এই পাঁচটি 'ক'-এর দ্বারা চিহ্নিত হননি। গুরু নানকের বংশধর বাবা পুরুষোত্তম লাল বেদীকে দেখেছি। তিনি ওসব মানতেন না। তাঁর স্ত্রী ফ্রীডা ইংরেজ। পুত্র কবীর পরে নামকরা চিত্রতারা হয়। সম্প্রতি সে পাঁচ তারা হোটেলের দ্বারা চিহ্নিত না হয়ে জঙ্গী শিখদের পাঁচ 'ক' কেশ ইত্যাদির দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। সিংহ পদবী ধারণ করেছে কিনা জানিনে। কিন্তু পূর্ববর্তী নয় গুরুর শিষ্যরাও এখনো বিদ্যমান। তাঁরা সবাই বোধহয় 'সিংহ' নন। গুরু গোবিন্দের অনুবর্তীদের বৈশিষ্ট্য তাঁরা খলসা বা জঙ্গী শিখ। তাঁদের এক হাতে শাস্ত্র, আরেক হাতে শস্ত্র। তাঁরা মোগলের সঙ্গে লড়েছেন, ইংরেজের সঙ্গে লড়েছেন। আবার ইংরেজের হয়ে জার্মানদের সঙ্গে লড়েছেন, ইটালিয়ানদের সঙ্গে লড়েছেন, জাপানীদের সঙ্গে লড়েছেন। কতক আবার আজাদ হিন্দ ফৌজভুক্ত হয়ে নেতাজী সুভাষের নির্দেশে লড়েছেন। এই যে জঙ্গী ঐতিহ্য এটা ভিন্দ্রানওয়ালে ও তাঁর উগ্রপন্থীরা অনুসরণ করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন। কিন্তু ঐতিহ্যটাও তো তাঁদের সঙ্গে নির্মূল হলো না। এই শেষ নয়।

শিখধর্ম গোড়ায় বৈষ্ণবধর্মের মতোই প্রেমধর্ম ছিল, এখনো তার ভিতরটা সেই রকমই রয়েছে। যুদ্ধ বা রাজনীতি হচ্ছে বহিরঙ্গ। কিন্তু কয়েকটা কথা হিন্দুরা কিছুতেই বুঝবে না। হিন্দুত্বই যদি শেষ কথা হতো তবে শিখত্বের প্রয়োজনই হতো না। হিন্দুদের কাছে বেদ অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয়। যেমন মুসলমানদের

কাছে কোরান ও খ্রীস্টানদের কাছে বাইবেল। তেমনি শিখদের কাছে গ্রন্থসাহেব। শিখরা বেদের অথরিটি মানে না। সেইজন্যে আর্যসমাজীদের সঙ্গে তাদের বিরোধ। আরো আগে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে। শিখরা আবার আর্যসমাজীদের মতো একেশ্বরবাদী তথা নিরাকারবাদী। তাদের মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তিকে স্থান দিয়েছিলেন হিন্দু মোহন্ত পরম্পরা। মোহন্ত সমেত সেসব বিদায় করে দেন অকালী সংস্কারক দল। সেই থেকে অকালীদেরই সর্বময় ক্ষমতা। ষাট বছর ধরে তারা সেই ক্ষমতা ভোগ করে এসেছেন। রাজনীতি ও সামরিকতা তাঁদের কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। স্বাধীন ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়েছে বলে তাঁরা তাঁদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ভুলতে পারেন না।

তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রও কি হিন্দুরা সকলে মেনে নিয়েছে? নেতারা কেউ বা যাচ্ছেন শঙ্করাচার্য দর্শনে, কেউ বা তিরুপতি তীর্থে গিয়ে বেঙ্কটেশ্বরের আশীর্বাদ নিচ্ছেন, একজন রাজ্যপাল তো মাথাও কামিয়েছেন, ধূলায় গড়াগড়িও দিয়েছেন। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' কী চমৎকার আচরণ! কী চমৎকার শিক্ষা! অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি সঙ্ঘ সারা দেশ জুড়ে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। যেখানেই যায় সেখানেই অহিন্দুদের মনে আতঙ্ক জাগায়, দাঙ্গা বাধায়। হিন্দু রাষ্ট্রে কি অহিন্দু থাকবে না? চেপে ধরলে বলে, থাকবে। হিন্দু অর্থে হিন্দু নামক দেশে যারা থাকে তারা ধর্মনির্বিশেষে সবাই হিন্দু। রাষ্ট্র শব্দটার বাংলায় এক অর্থ, হিন্দীতে আরেক। বাংলায় রাষ্ট্র বলতে বোঝায় ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্র। হিন্দীতে বোঝায় ইংরেজ, আমেরিকান, জাপানীর মতো একটি নেশন। অর্থাৎ হিন্দুরাও ইংরেজদের মতো একটি নেশন, অহিন্দুরাও তার সামিল। এর প্রতিবাদে মুসলমানরা ইতিমধ্যেই পাকিস্তান হাসিল করে নিয়েছে। এর প্রতিবাদে শিখেরা যদি শিখিস্থান বা খলিস্থান আদায় করে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তবে তাদের বাধা দিতে পারি, নিরস্ত্র করতে পারি, কিন্তু নিরস্ত করব কী করে?

হিন্দুদেরই মনটাকে পরিষ্কার করতে হবে। হিন্দুরা একটা নেশন নয়, তারা ভারতীয় নেশনের একটা অংশ। এটা হিন্দু রাষ্ট্র নয়, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। শিখরা স্বতন্ত্র একটি ধর্ম সম্প্রদায়, যেমন মুসলমানরা, যেমন খ্রীস্টানরা। হিন্দুদের সঙ্গে তাদের নিকট সম্পর্ক, বিয়ে সাদী চলে, কিন্তু পূজা পার্বণ এক নয়, বিবাহাদির দশকর্মও এক নয়। শিখরা মুসলমানকেও শিখ করে নেয়, সমান পবিত্র মনে করে। হিন্দুরা তা করে না। মুসলমানকে মনে মনে অপবিত্র জ্ঞান করে। মুখে ভাইভাই

বলে। শিখদের মন্দিরে মুসলমানদেরও অবাধ প্রবেশ, হিন্দুর মন্দিরে তো তথাকথিত অস্পৃশ্যদেরই প্রবেশ নেই। অমৃতসরের হরিমন্দিরের ভিত্তিশিলা স্থাপন করেন এক মুসলিম সন্ত। মুসলমানদের সঙ্গে গুরু নানকের মধুর সম্পর্ক ছিল। তিনি তো মক্কায়ও গেছলেন, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরেও গেছলেন। গ্রন্থসাহেবে হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি সর্ব ধর্মের স্তব সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই সম্প্রদায়কে ভারতীয় নেশনভুক্ত করতে চাইলে হিন্দু নেশনের মোহ ত্যাগ করতে হবে। আর একটি মোহ সকলের উপর হিন্দী ও দেবনাগরী চাপানো। তা নইলে নাকি সংহতি হবে না। কেন হবে না? সংহতি কি সুইটজারল্যাণ্ডের নেই? বেলজিয়ামের নেই? কানাডার নেই? এত ঠুনকো যদি হয় আমাদের সংহতি তবে একে রক্ষা করবে কে? কোন্ মন্ত্রবলে? শেষ পর্যন্ত সর্বত্র মিলিটারি শাসনই চাপাতে হবে। কিন্তু ভারতের সৈন্যদলে বিস্তর অহিন্দু ও তাদের অসামান্য প্রভাব। সেটা সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষ। মিলিটারি রুল হলে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনই হবে। তা বলে আমি মিলিটারি রুলকে স্বাগত করব না। সংবিধানকেই সযত্নে পাহারা দেব। সেই আমাদের সংহতির বর্ম। শিখদেরও আপনার করতে হলে হিন্দুধর্মের বন্ধনে নয়, ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের বর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। সংবিধানের বাইরে গিয়ে হিন্দু নেশন, হিন্দী ন্যাশনাল ভাষা, দেবনাগরী ন্যাশনাল লিপি এসব তত্ত্ব বর্জন করতে হবে। হিন্দী অফিসিয়াল ভাষা হতে পারে, কিন্তু ন্যাশনাল ভাষা নয়; হিন্দী ন্যাশনাল ভাষা হলে তামিলও ন্যাশনাল ভাষা, তেলেগুও ন্যাশনাল ভাষা।

হিন্দু বলে পরিচয় দিতে শিখদের আপত্তি যেমন প্রবল হিন্দীকে প্রাধান্য দিতেও তেমনি প্রবল আপত্তি। দেবনাগরী সম্বন্ধেও একই কথা। তাদের আশঙ্কা হিন্দীর চাপে পাঞ্জাবী জখম হবে, দেবনাগরীর চাপে গুরুমুখী খতম হবে। তাদের বৈশিষ্ট্য লোপ পেলে তারা হিন্দুত্বের সমুদ্রে বিলীন হবে। যেমন হয়েছে বৌদ্ধরা। সেটা হিন্দুদের দিক থেকে পরম কাম্য হতে পারে, শিখদের দিক থেকে মহানির্বাণ।

খলিস্থান না হোক, এমন কিছু হোক যা শিখদের চোখে পাটিয়ালা, কপুরথালা প্রভৃতি শিখশাসিত দেশীয় রাজ্যের সমান। যার কাশ্মীরের মতো স্পেশাল স্টেটাস। তার কমে তারা শান্ত হবে না। এই অশান্তি লেগেই থাকবে। সীমান্তে অশান্তি কি ভারতের পক্ষে নিরাপদ? সৈন্যদলেও কি সে অশান্তি প্রবেশ করবে না? সময়ে মিটমাট না করলে খলিস্থানের দাবী আরো প্রবল হবে ও তা নিয়ে আরো রক্তপাত হবে। বলা বাহুল্য, শিখদের সঙ্গে মিটমাটের অর্থ অকালীদের সঙ্গে মিটমাট, যেমন মুসলমানদের সঙ্গে মিটমাটের অর্থ মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট। অকালীদের

উপেক্ষা করে আর কারো সঙ্গে মিটমাট ধোপে টিকবে না। মুসলিম লীগের মতো ওরা এখনো সম্পূর্ণ ভারতবিমুখ হয়নি। এখনো সময় আছে।

পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে পাকিস্তানের যে দোটানা হয়েছিল এখন পাঞ্জাবকে নিয়ে অনেকটা সেইরকম দোটানা। সময়ে মিটমাট করলে পূর্ব পাকিস্তান একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত না। ক্ষমতার পুনর্বণ্টনের পর পাকিস্তানেই থাকত। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অনুসরণে সিন্ধুপ্রদেশও ছয় দফা দাবী পেশ করত। তার পরে বা আগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ফেডারেশনের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। সেখানকার পাঞ্জাবীদের পক্ষে সেটা ছিল একটা সর্বনেশে প্রস্তাব। তাঁরা সামরিক সমাধানই পছন্দ করেন। কিন্তু চৈনিক বা আমেরিকান সাহায্য এসে পৌঁছবার আগেই মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা পায় ভারতীয় সাহায্য। সেটা ভূগোলের কৃপায়। পাকিস্তানের পশ্চিম ভাগ থেকে পূর্ব ভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাকী স্থান নিয়েই পাকিস্তান পুনর্গঠিত হয়। পাঞ্জাবীরা আরো জবরদস্ত হয়, সিন্ধী ও পাঠানরা আরো কমজোরী। ভুট্টোর মালুম ছিল না তিনি কাদের খেলা খেলছেন। জানলে হুঁশিয়ার হতেন।

আমাদের সামনেও অনেকটা একই রকম দোটানা। শিখপ্রধান পাঞ্জাবকে যদি স্পেশাল স্টেটাস দেওয়া হয় তবে খ্রীস্টানপ্রধান নাগাল্যাণ্ড মেঘালয়কেও কেন নয়? পাঞ্জাবীভাষী পাঞ্জাবকে যদি স্পেশাল স্টেটাস দেওয়া হয় তবে অসমীয়াভাষী আসামকেও কেন নয়? তামিলভাষী তামিলনাড়ুকে কেন নয়? এর পরে তো ওরা এক একটি বলকান রাষ্ট্র হতে চাইবে। সে জলতরঙ্গ রোধিবে কে? ভাবনার কথা বইকি। কিন্তু মনঃস্থির না করলে শিখদের আয়ত্তের মধ্যে রাখা ক্রমশ আরো কঠিন হবে। যদি না হিন্দু রাষ্ট্রবাদদের সর্বগ্রাসী মাকড়সার জাল আপনা থেকে সঙ্কুচিত হয়। হিন্দু ভোটে জয়লাভের আশা যাঁরা রাখছেন তাঁদের অন্তরপরিবর্তন হবে এটা বোধ হয় মরীচিকা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা মাঝখানে কিছু কমেছিল, আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। পুলিশ দমন করতে পারছে না, কারণ সরষের ভিতরেই ভূত। মিলিটারী পাঠাতে হচ্ছে। এর জন্যে চাই জবরদস্ত কেন্দ্রীয় সরকার। কেমন করে সেই সরকারকে পরামর্শ দিই বিভিন্ন রাজ্যকে স্পেশাল স্টেটাস দিয়ে নিজের ক্ষমতা খর্ব করতে।

অথচ এটাও বুঝি যে ফেডারেশন হচ্ছে ভারতের মতো বহুধর্মী, বহুভাষী ও বহু রেস বিশিষ্ট দেশের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যবস্থা। ফেডারেশনে প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যকে বহু পরিমাণে স্বাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। বিসমার্ক দিয়েছিলেন ক্যাথলিকপ্রধান

বাভেরিয়াকে। ছেলেবেলায় আমি দেখতুম একটি পেনসিলের উপর লেখা আছে 'মেড ইন বাভেরিয়া', আরেকটির উপর 'মেড ইন অস্ট্রিয়া', আবার আরেকটির উপর 'মেড ইন জার্মানী।' যেন তিনটিই স্বাধীন রাষ্ট্র। অনেক বিপর্যয়ের পর অদ্যাবধি বাভেরিয়া পশ্চিম জার্মানীর সামিল হয়েও স্বাধিকার ভোগ করছে। একুশ বছর আগে যখন পশ্চিম জার্মানীর অতিথি হয়ে যাই তখন আমাকে কাগজপত্র দেখিয়ে বাভেরিয়া সরকারেরও অতিথি হতে হয়, দু'তিনদিনের জন্যে। ওটা একটা ফর্মালিটি। তা হলেও বাভেরিয়ানদের কাছে মহামূল্য। হিটলার অবশ্য গায়ের জোরে সব স্বাতন্ত্র্য মুছে দিয়েছিলেন, কিন্তু সইবে কেন? অস্ট্রিয়া আবার এখন স্বাধীন রাষ্ট্র। বিসমার্ক সেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রটেস্টাণ্ট প্রাসিয়া ক্যাথলিক অস্ট্রিয়াকে নিয়ে এক নেশন গঠন করতে পারেনি, যদিও ভাষা একই, রেস একই।

আমরা ফেডারেশন গড়তে গিয়ে বাধা পাই মুসলিম লীগের দিক থেকে। এখন পাচ্ছি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর দাঙ্গা হাঙ্গামার অন্তহীন প্রবণতা থেকে। অঙ্গরাজ্য-গুলির সঙ্গে কেন্দ্রের যে বন্ধন তা রেশমী সুতোর রাখীবন্ধন। লোহার শিকলের নয়। কেন্দ্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজ্যবিশেষ যদি ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তাকে লোহার শিকলে বেঁধে রেখে ডাণ্ডাবেড়ী পরানো সুবুদ্ধি নয়। রাজ-নৈতিক সমাধান অন্বেষণ করতে হবে। এতদিন সে রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে একটি রাজ্যকে সন্ত্রাসবাদীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্যে সৈন্য মোতায়েন করতে হয়েছে। এটা কি মাসের পর মাস চলতে পারে? বছরের পর বছর? আর প্রেসিডেন্টের শাসনকাল কি সীমাবদ্ধ নয়? ইংরেজ আমলেও সৈন্যদের উপর এত বড়ো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।

ইংরেজ আমলে আমি যখন জেলা শাসকের পদে নিযুক্ত হই তখন আমার কনফিডেনশিয়াল বাক্স খুলে দেখি তাতে একটি পুস্তিকা আছে। তাতে নির্দেশ ও উপদেশ দেওয়া হয়েছে কখন কোন অবস্থায় মিলিটারিকে ডাকতে হয়। হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে মিলিটারিকে ডাকলে মিলিটারিই উপরওয়ালা হবে, ম্যাজিস্ট্রেট নয়। মিলিটারি যা করবে তার উপর ম্যাজিস্ট্রেটের কণ্টোল থাকবে না। ম্যাজিস্ট্রেট হবেন সহযোগী বা অধস্তন। সেটা তাঁর পক্ষে সম্মানের নয়। তাঁর প্রেস্টিজহানি হবে। এই পুস্তিকা আমি অন্যান্য জেলাতেও দেখেছি। এটাই সিভিল অফিসারদের গাইড। আমরা মিলিটারি অফিসারদের স্বেচ্ছায় ডাকতুম না। তবে গভর্নমেণ্ট থেকে পাঠালে কী আর করা যায়। সে রকম উপলক্ষ আমি যতদূর জানি একবারই ঘটেছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর সে জেলাকে ঠাণ্ডা

করতে। তিন বছর পরে আমি সেখানে জুডিসিয়াল ট্রেনিং-এর জন্যে যাই। স্থানাভাবে সারকিট হাউসে থাকি। দেখি সেখানে মিলিটারি অফিসারদের অধিষ্ঠান। দিনরাত অস্ত্র হাতে গুর্খা পাহারা দিচ্ছে। আমিও একহিসাবে সপরিবারে নজরবন্দী। প্রাণ হাতে করে, মান হাতে করে তিন মাস কাটাতে হয়। সরকার আমাকে বাসা দিতে পারেন না, আমিও গাছতলায় থাকতে নারাজ। সারকিট হাউসের সেই অংশটা খালি করে না দিলে আগন্তুক সিভিল অফিসাররা কোথাও উঠতে পারছিলেন না। সরকার আমাকে ঢাকায় পাঠান। আমরাও মিলিটারির খপ্পর থেকে বাঁচি। তবে তাঁরা খুবই ভদ্র।

আমার তো মনে হয় না যে প্রাক্তন আই. সি. এস অফিসার ভৈরবদত্ত পাণ্ডে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল হওয়ার পর মিলিটারির খপ্পরে পড়ে একটুও সুখী হয়েছিলেন। মিলিটারি নিজের প্রয়োজনমতো কাজ করে যায়। সিভিল সায় দিতে বাধ্য হয়। গভর্নরের পোজিশনটা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেরই মতো খাটো। পাণ্ডে ইস্তফা দিয়ে বিদায় নেন। নইলে অকাল তখত জখম করার দায় তাঁকেও বহন করতে হতো। যদিও দায়িত্বটা তাঁর নয়। দিল্লীতে যাঁদের বাস স্থানীয় রিয়ালিটি থেকে তাঁরা অনেক দূরে। রাজ্যপালই তাঁদের চোখ কান। আবার চণ্ডিগড়ে যিনি থাকেন রিয়ালিটি থেকে তিনিও কতকটা দূরে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই তাঁর চোখ কান। এঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা মতামতের জন্যে তোয়াক্কা না রেখে মিলিটারি যা খুশি করে যেতে পারে। সব কিছুই কি ঠিক? ঠিক বেঠিক বিচার করবে কে? মিলিটারি না সিভিল অথরিটি? সুতরাং যথাসম্ভব অবিলম্বে মিলিটারিকে ভারমুক্ত করাই সঙ্গত।

মাস ছয়েক আগে একটি ইন্টারভিউতে আমি বলেছিলুম সামরিক সমাধান নেই, রাজনৈতিক সমাধানের কথাই ভাবতে হবে। সেটা অবশ্য আমার কাজ নয়, রাজনীতিকদের কাজ। শেষপর্যন্ত তাঁরা মিলিটারির উপরেই বরাত দিলেন। এখন বাঘের পিঠ থেকে নামা আরো কঠিন। নামলে কুমীরের মুখে পড়তে হবে। সন্ত্রাসবাদীরা গভীর জলে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। নানা সূত্র থেকে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করবে। সব ক'টা যে বিদেশী সূত্র তাও নয়। তা হলে কি অনন্তকাল মিলিটারি অবস্থান? সিভিলের বকলমে মিলিটারি রুল? জানিনে, তবে এইটুকু জানি যে রাজ-নৈতিক সমাধানের যতই বিলম্ব হবে আমাদের সামনে বিকল্প সংখ্যা ততই কমে আসবে। মুসলিম লীগের বেলা যেমন হয়েছিল। শেষের দিকে দুটিমাত্র বিকল্পে ঠেকেছিল। হয় পার্টিশন নয় সিভিল ওয়ার। জিন্না সাহেব তৈরি ছিলেন কয়েক লাখ মুসলমান কোরবানী দিতে। অবশ্য কয়েক লাখ হিন্দু শিখ কোতল করে। ভিন্নান-

ওয়ালে ও তাঁর দলবলও না মেরে মরেন নি। শ'তিনেক উগ্রপন্থী যেমন নিহত হয়েছে শ'খানেক সৈনিকও তেমনি। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অফিসার। উগ্রপন্থী নেতা যদি স্থির করেন যে তিনি দশ হাজার প্রাণ খরচ করবেন তবে সরকারকেও স্থির করতে হবে তাঁরাও আড়াই হাজার প্রাণ খরচ করবেন। পরে এই হার আরো বাড়তে পারে। তখন হয় খলিস্থান স্বীকার, নয় অন্তহীন গৃহযুদ্ধ। শিখরা যে কতদূর যাবে তা কে বলতে পারে? ইংরেজরাও তাদের সহজে বশ করতে পারেনি। মোগলরা তো আদৌ পারেনি।

ইতিমধ্যে ঘটে গেছে আরেক দফা হাইজ্যাকিং। ভাগ্য ভালো, দুবাই সরকার ভারতের মুখ রক্ষা করেছেন। যাত্রীদের বাঁচিয়েছেন, প্লেন ফেরৎ দিয়েছেন, হাই-জ্যাকারদের সমর্পণ করেছেন। কিন্তু হাইজ্যাকিং কি আর কখনো হবে না? কৃপাণ কি নিষিদ্ধ হয়েছে? হলে শিখরা কি প্রতিবাদ করবে না? প্লেনে ওঠা বন্ধ করে দেবে না? শত্রু মিত্র সবাইকে সন্দেহ করা বিজ্ঞতা নয়। আবার সবাইকে বিশ্বাস করাও বিপজ্জনক। শিখ দেখলে হিন্দু যাত্রীরাও ডরাবে। প্লেনে ওঠা বন্ধ করবে। তা হলে কি হিন্দু প্লেন ও শিখ প্লেন দু'প্রস্থ প্লেন হবে? কেবল হিন্দুদের জন্যে ও কেবল শিখদের জন্যে? কেবল যাত্রীরা নয়, পাইলটরাও ভয় পাবে। তা হলে কি শিখ পাইলট ও হিন্দু পাইলট? এ এক দারুণ প্রশাসনিক সমস্যা।

ভিন্দ্রানওয়ালের নিধনের সংবাদ পেয়ে হিন্দুরা নাকি মিষ্টান্ন বিতরণ করেছে। ওদিকে শিখদের ঘরে ঘরে হাহাকার। এই যেখানকার অবস্থা সেখানে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন হবে কী করে? সেটা তো আরো সুদূর হলো। শিখেরা যদি হিন্দু প্রার্থীদের ভোট না দেয়, হিন্দুরা যদি শিখ প্রার্থীদের ভোট না দেয় তবে তো কেউ বলতে পারবেন না যে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন কোন্ সুবাদে? পেছনে হিন্দু মেজরিটি আছে বলে? বা শিখ মেজরিটি আছে বলে? তা হলে তো সেটা শিখিস্থান বা খলিস্থানের দিকেই প্রথম পদক্ষেপ। যাঁর উপর অর্ধেক নাগরিকের আস্থা নেই তিনি শাসন করবেন কী করে? কংগ্রেসী শিখদের পক্ষে নির্বাচিত হওয়া দুষ্কর হবে। তাঁরা হয়তো হিন্দু ভোটেই জিতবেন। সেটা সংবিধানসম্মত হলেও উত্তম রাজনীতি নয়।

সমষ্টিগতভাবে শিখ সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন করতে হবে, অথচ তার দরুণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সমষ্টিগতভাবে অনাস্থাভাজন হলেও চলবে না। ক্ষুরধার পন্থা। এমন সঙ্কট একবার মুসলিম সম্প্রদায়কে নিয়েও হয়েছে। এমন এক সমাধান যেটা সামগ্রিক

ভাবে হিন্দু বা মুসলমান কোনো সম্প্রদায়ই অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেনি। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যদি শিখদের নিয়েও হয় তা হলে বুঝতে হবে আমরা ফ্রান্সের বুরবঁ রাজকুলের মতো কিছুই ভুলিনি, কিছুই শিখিনি। গণতন্ত্র কেবল সংবিধানের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে না। কোনো মতে কয়েকটা ভোট বেশী পেলেই রাজত্ব করার অধিকার বর্তায় না।

শিখরা ইংরেজদের কাছ থেকে অনেকরকম অনুগ্রহ পেয়েছিল। প্রভুত ভূসম্পত্তি, খালের ধারে জমি, স্বতন্ত্র নির্বাচন, আইনসভায় অনুপাতের অধিক আসন, সিভিল সার্ভিস ও সৈন্যদলে বাঁধা চাকরি আর ওয়েটেজ। ক্ষমতার হস্তান্তরের আগে যে কথাবার্তা হয় তার মধ্যে একথাও ছিল যে শিখদের বেলা কেবল সংখ্যা দেখে গুরু লঘু বিচার করা চলবে না। দেখতে হবে তাদের সম্পত্তি কত। মুসলমানরা তো বেশীর ভাগ বহিরাগত দিন মজুর। তাদের সম্পত্তি কতটুকু? শিখদের সম্পত্তি তাদের বহুগুণ। সেই সুবাদে তাদের লাহোর দেওয়া উচিত। বস্তুত শিখ রাজা ও ইংরেজ রাজা দান খয়রাত করতে করতে শিখদের সম্পত্তি বহুগুণ করেছিলেন। সেটা অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহে প্রাণদানের পরিবর্তে প্রতিদান। শিখরা রাজার জন্যে জান কবুল করেছিল। হিন্দুরা সেটা করেনি। মুসলমানরাও না। সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল। শিখ ছিল না। শিখ ছিল বরং বিপরীত শিবিরে। কালাপানি পার হয়ে ইউরোপে যেতে, আফ্রিকায় যেতে, চীনদেশে যেতে, ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে শিখও প্রস্তুত ছিল। ওজর আপত্তি করেনি। তুরস্কের বিরুদ্ধে লড়তে মুসলমান ইতস্তত করেছে, শিখ তা করেনি। শিখরা সত্যিই 'নির্মম, নির্ভীক'। ইংরেজরা কতরকম ময়লা কাজ যে ওদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। রবীন্দ্রনাথ শিখদের ভালোবাসলেও শাংহাইতে ওদের 'শূদ্রধর্মে'র নিন্দা করে একবার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। চীনারা এখনো তাদের দুষ্কৃতির কথা ভোলেনি। অনিলকুমার চন্দ যখন কেন্দ্রীয় সরকারের উপমন্ত্রী তখন নেহরুর নির্দেশে চীন ভ্রমণ করে এসে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তা আমাকে দেখিয়েছিলেন। কোথায় যেন শিখদের একটি গুরুদ্বারা আছে, সেটি রক্ষা করছে একজন শিখ। তার সঙ্গে নয়া চীন কর্তৃপক্ষ এত খারাপ ব্যবহার করছেন যে সে আর টিকতে পারছে না, কিন্তু গুরুদ্বারা কার জিম্মা দিয়ে যাবে।

ক্যাবিনেট মিশন তাঁদের প্রস্তাবিত কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে পাঞ্জাবকে দেন মোট আটাশটি আসন। তার মধ্যে ষোলটি দেন মুসলমানদের, আটটি সাধারণকে, চারটি শিখদের। গোটা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে সর্ব মোট ব্রিটিশ ভারতের

আসন সংখ্যা ছ'শ বিরানব্বই তার মধ্যে শিখদের মাত্র চারটি। শিখদের জন্যে বিশেষ রক্ষাকবচ কোথায়। ইণ্ডিয়ান আর্মিতেও কি শিখ সংখ্যানুপাত শতকরা এক থেকে দুই হবে? শিখ নেতারা সেই অ্যাসেম্বলি বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন। পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে তাঁরা বয়কট সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব থেকে উদ্ধার করছি :

"....the Congress recognises that injustice has been done to the Sikhs by the Cabinet Mission's proposals and has declared that it will give all support to the Sikhs in redressing their legitimate grievances and securing for the Sikhs adequate safeguards for protecting their interests...This resolution of the Working Committee must be read along with the Lahore resolution of 1929—that no solution of the communal problem in any future constitution would be acceptable to the Congress that did not give full satisfaction to the Sikhs—as well as with the recent speeches and statements of the prominent Congress leaders to the effect that the Sikhs must be given similar safeguards as are provided to the two major communities in paragraphs 15 and 19 of the Cabinet Mission proposals."

ক্যাবিনেট মিশন দুই প্রধান সম্প্রদায়কে সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন, শিখদের সমান মর্যাদা দেননি। এতেই তাঁরা ক্ষুব্ধ হন। এ ক্ষোভ দূর করার জন্যে মিশনও কিছু করেন না, মুসলিম লীগও না, কংগ্রেসই যা করার করে। তাও অনির্দিষ্ট-ভাবে। যাই হোক, শিখরা কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলিতে আসেন, কিন্তু লীগপন্থীরা আসেন না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সর্বসম্মত সংবিধান প্রণয়ন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন না, ভারত ভাগ করে ক্ষমতার হস্তান্তর করে চলে যান। মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাবে কংগ্রেস ও লীগ নেতারা যখন সায় দেন তখন শিখ প্রতিনিধি সর্দার বলদেও সিং শিখদের হয়ে সায় দেন। এরপর কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি বলতে যা বোঝায় তা খণ্ডিত ভারতের। তাতে খণ্ডিত পাঞ্জাবের শিখ প্রতিনিধিরাও থাকেন। সকলের জন্যেই স্বতন্ত্র নির্বাচন তথা ওয়েটেজ উঠিয়ে দেওয়া হয়, সুতরাং তাঁরা বলতে পারেন না যে তাঁদের প্রতি অবিচার হয়েছে। ব্যতিক্রম যেটা হয় সেটা তফসিলী। হিন্দু, শিখ ও ট্রাইবদের বেলা, সাময়িকভাবে। ধর্ম অনুসারে আসন ভাগ বা মন্ত্রিত্ব ভাগ

বা চাকরি ভাগ কারো খাতিরেই হয় না। ভূতপূর্ব ব্রিটিশ রাজ ভূতপূর্ব শাসন-তন্ত্রগুলিতে মুসলিম ও শিখ সম্প্রদায়দ্বয়কে যেসব সুবিধা দিয়েছিলেন সেসব স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। তবে প্রত্যেকটি সম্প্রদায়কে অভয় দেওয়া হয় যে ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তই তাঁদের সম্মতি না নিয়ে গৃহীত হবে না। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে ধর্মীয় ব্যাপার রাজনৈতিক ব্যাপার নয়, রাজনৈতিক ব্যাপার ধর্মীয় ব্যাপার নয়।

মুসলমানরা ও শিখরা ধর্মের থেকে রাজনীতিকে ও রাজনীতির থেকে ধর্মকে পৃথক করতে অভ্যস্ত নন। পাকিস্তানে তথা বাংলাদেশে এখনো এর মীমাংসা হয়নি। খলিস্তান হলেও যে মীমাংসা হবে তা নয়। মোল্লা আর মিলিটারি মিলে গণতন্ত্রকে বনবাসে পাঠিয়েছেন। খলিস্থান হলেও তেমনি সন্ত আর মিলিটারি মিলে গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠাবে। খণ্ডিত না হলে ভারতকে এঁরা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রণয়ন করতেই দিতেন না। এখন খণ্ডিত ভারতে সাঁইত্রিশ বছর বাস করার পরও সেই একই অগণতান্ত্রিক মনোভাব। শিখদের খাতিরে সংবিধান সংশোধন করলে খ্রীস্টানদের খাতিরেও করতে হবে। মুসলমানদের জন্যেই বা কেন নয়? তাঁদের সংখ্যা তো আরো বেশী, বিশেষত কাশ্মীরে। অপর পক্ষে এটাও সত্য যে মুসলমানরা পাকিস্তান পেয়েছে, শিখরা স্বাধীন রাষ্ট্র পায়নি। এই সত্য শিখ ধর্মগুরু ও ধর্ম-যোদ্ধাদের নতুন প্রেরণা ও প্ররোচনা জোগাচ্ছে। ভারত যদি আবার খণ্ডিত হয় আমি বিস্মিত হব না, তবে আমার বিশ্বাস রেফারেণ্ডাম হলে অধিকাংশ শিখ ভারতের পক্ষেই ভোট দেবে। খলিস্থানের পক্ষে নয়। তাই যদি হয় তবে বাকী থাকে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি কীভাবে করতে হবে। প্রশ্নটা হচ্ছে দেশ ভাগ নিয়ে নয়, ক্ষমতা ভাগ নিয়ে। এ প্রশ্নটা বিবেচনা করার জন্যে কমিশন হয়েছে। একজন শিখই তার সভাপতি। কমিশনের সুপারিশের জন্যে আমরা অপেক্ষা করব।

১৯৮৪ (এই প্রবন্ধ লেখার সময় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জীবিত ছিলেন।)

হিন্দু শিখ সমস্যা

হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়ে পঞ্চাশ বছরের উপর লিখে আসছি। সে সমস্যা আমার জন্মের পূর্বেও ছিল, জন্মাবধি তার সঙ্গে আমি পরিচিত। কখনো কল্পনাও করিনি যে দেশ দু'ভাগ হয়ে যাবে, এক ভাগের নাম হবে পাকিস্তান। সেই ট্র্যাজেডীর পর কেই বা জানত যে আরো এক ট্র্যাজেডী অপেক্ষা করছে। হিন্দু শিখ সমস্যা, তার থেকে শিখদের স্বর্ণমন্দিরের চৌহদ্দিতে স্বদেশের শিখ নাগরিকদের সঙ্গে ভারতীয় সেনার ট্যাঙ্ক প্রভৃতি নিয়ে 'অপারেশন ব্লু স্টার', তার থেকে আপন দেহরক্ষীদের হাতে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর নিধন, তার থেকে দিল্লীতে কয়েক হাজার নিরীহ শিখের উপর হিন্দু জনতার বদলা, তার থেকে সম্ভবত সন্ত্রাসবাদীদের বোমায় এয়ার ইণ্ডিয়ার জাম্বো জেট ধ্বংস ও তিনশো জন নিরীহ যাত্রীর বিনাশ।

সকলেই উপলব্ধি করেন যে অবিলম্বে একপ্রকার রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত না হলে হিন্দুরা আবার বদলা নেবে ও সামরিক সমাধান ছাড়া আর কোন সমাধানের পথ খোলা থাকবে না। নতুন প্রধান মন্ত্রী গড়িমসি পছন্দ করেন না। যা করার তা দ্রুতগতিতে করেন। তাড়াহুড়ার দরুন খুঁত থেকে যায়। কিন্তু নিখুঁতের জন্যে অপেক্ষা করলে বড়ো বেশী বিলম্ব হয়ে যেতে পারে। 'বিলম্বে কার্যসিদ্ধি' সাধারণত সত্য। কিন্তু এটা সাধারণ সময় নয়। তাই নতুন প্রধান মন্ত্রী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সন্ত হরচন্দ সিং লঙ্গোয়ালের সঙ্গে চুক্তি-বদ্ধ হন। এই চুক্তি যে শিখদের সব ক'টি দল উপদলের কাছে গ্রহণীয় তা নয়। প্রধান মন্ত্রীর ধারণা, অধিকাংশ শিখ সন্ত হরচন্দ সিং লঙ্গোয়ালের পেছনেই দাঁড়াবে। সেই ধারণার ভিত্তিতেই তিনি পাঞ্জাবে সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত

নেন। এটাও একটা ত্বরিত সিদ্ধান্ত। সন্তের এতে সায় ছিল না, তবে তিনি শেষপর্যন্ত নির্বাচনে জনমত যাচাইয়ের পন্থা সমর্থন করেন। জনমত যদি সন্তের দিকে যায় তবে চরম পন্থীদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। তারা নির্বাচন তো পণ্ড করবেই। পথের কাঁটা বলে সন্তকেও সরাবে; যাতে তিনি প্রচারকার্য করতে না পারেন।

শান্তিকামী সন্ত নিহত হলেন। অন্যান্য শান্তিকামীরাও বিপন্ন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর তো কথাই নেই। পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদীরা এখন দিল্লীতেও সক্রিয়। পর পর ললিত মাকেন ও অর্জুন দাস নিহত। ললিতের সঙ্গে তাঁর পত্নী গীতাঞ্জলি ও অন্য একজন। অর্জুনের সঙ্গে তাঁর দেহরক্ষী। প্রকাশ্য দিবালোকে বহুজনের সাক্ষাতে এসব ঘটনা ঘটেছে। আততায়ীদের হদিস নেই। সেই সনাতন পদ্ধতি স্কুটারে করে আগমন, একসঙ্গে তিন মূর্তি, হাতে পিস্তল ও স্টেনগান, কার্যসিদ্ধির পর স্কুটারেই পলায়ন। এই তিন চার বছরের মধ্যে কোথাও কেউ ধরা পড়েনি। লাখ টাকার বিনিময়েও কেউ ধরিয়ে দেয়নি। দিলে নিজেরই প্রাণদণ্ড। উল্টে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে তারা, যারা খলিস্তানে বিশ্বাসী। খলিস্তান হাসিলের রাজপথ ছিল ভিন্দ্রানওয়ালের সম্মুখ সময়। রাজপথ রুদ্ধ, তাই চোরা পথ দিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের অতর্কিত বোমা বা গুলী।

এদের সংখ্যা যদি শতখানেক হয়ে থাকে আরো কয়েকজনের নিধনের পর এদের উৎপাত থামবে। কিন্তু যদি হাজার কয়েক হয়ে থাকে? যদি লাখ খানেক হয়ে থাকে! আমি যতদূর জানি বাঙালী সন্ত্রাসবাদীদের সংখ্যা ত্রিশ বছরে পাঁচশো ছাড়িয়ে যায়নি। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় তাদের কায়িক বা আর্থিক বা নৈতিক সমর্থন জোগায়নি। হিন্দুদের মধ্যেও তাদের সমর্থক সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ। তাই তাদের দমন করা তেমন দুরূহ ছিল না।

বিস্তর শিখ বসবাস করছেন কানাডায়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, গ্রেট ব্রিটেনে। এঁদের বিপুল অর্থ। সেই অর্থ দিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করা সেসব দেশে নিষিদ্ধ নয়। অস্ত্র পাচার হয়ে আসছে পাকিস্তান দিয়ে। শিখ সন্ত্রাসবাদীদের আর যারই হোক অস্ত্রের অকুলান নেই। স্কুটারও তাদের দখলে অজস্র। নিজেরটা না হলে পরেরটা নিয়েও মানুষ শিকারে বেরোনো যায়। অব্যর্থ লক্ষ্য। আশ্চর্যের ব্যাপার, শিবের বাবাও টের পায় না, অথচ পুলিশে, 'সি. আর. পি'তে, 'বি. এস এফ' এ, আর্মিতে রাজ্য এখন ছয়লাপ। সন্ত্রাসবাদীরা মানুষ শিকারের

পর জলের মাছের মতো জলে মিলিয়ে যাচ্ছে। শিখরাই রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। গ্রাম অঞ্চলে তাদেরই একাধিপত্য। হিন্দু পুলিশ সেখানে কী করতে পারে? শিখ পুলিশ অপ্রিয় হতে যাবে কেন? তাদের অনেকেই তো খলিস্থানে বিশ্বাসী।

গত দুই মহাযুদ্ধে শিখ সৈন্যরা মিত্রপক্ষের হয়ে জার্মানদের সঙ্গে দারুণ লড়েছিল। তৃতীয় মহাযুদ্ধেও ইংলণ্ডে আমেরিকায় বসবাসকারী শিখেরা মিত্রপক্ষের হয়ে রাশিয়ার সঙ্গে লড়বে। এমন নির্ভরযোগ্য যে সম্প্রদায় তার প্রতি পাশ্চাত্য শক্তিদের সহানুভূতি তো থাকবেই। বিশেষ করে এই কারণে যে ভাবী মহাযুদ্ধে ভারতের উপর নির্ভর করা চলবে না। খলিস্তানী বৈদেশিক নীতি পাশ্চাত্য বৈদেশিক নীতির সঙ্গে এক ছাঁচে ঢালা। খলিস্তান যদি সত্যি কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হয় তা হবে পাশ্চাত্য শক্তিদের একটি মিত্র। যেমন ইসরায়েল। ইসরায়েলের মতোই সে বাইরে থেকে অস্ত্রসাহায্য, অর্থসাহায্য পাবে। যেমন করে হোক একটা সামুদ্রিক বন্দর আদায় করে নেবে। সমুদ্রপথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। তার সোভরেনটি সে বিনা যুদ্ধে সমর্পণ করবে না। পাকিস্তানের মতো সে পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বারা আত্মরক্ষা করার কথা ভাববে।

শিখদের ইতিহাসে স্বাধীন রাজ্যের কল্পনা ছিল। 'রাজ করেগা খলসা।' মহারাজা রণজিৎ সিংহ এ কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেন। তাঁর পরেই প্লাবন। রাজ্য হারাবার পরেও তাঁর বংশধর দলীপ সিং রাজ্য ফিরে পাবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। পাঞ্জাব ব্রিটিশ শাসনভুক্ত হয় ১৮৪৯ সালে। ব্রিটিশ শাসন এর পরে মাত্র ৯৮ বছর স্থায়ী হয়। এক শতাব্দীরও কম সময়। এত কম সময়ের মধ্যে শিখরা কেমন করে ভুলে যাবে যে তারাই ছিল সমগ্র পাঞ্জাবের মালিক? সে রাজ্যের উপরওয়ালা কেউ ছিল না। সে রাজ্য একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র। তারা যদি এক শতাব্দী ধরে স্বপ্ন দেখে এসে থাকে যে তারা আবার তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র ফিরে পাবে তা হলে সেটা এমন কিছু অযৌক্তিক নয়। অযৌক্তিক নয় মুসলমানদের স্বপ্নও, যদি মনে রাখি যে নামেমাত্র হলেও বাহাদুর শাহ জাফর ১৮৫৮ পর্যন্ত মোগল সম্রাট ছিলেন। তাঁর পর থেকে মাত্র ৮৯ বছরে মুসলমানরা ভুলে যেতে পারে না যে তারাই ছিল হিন্দুস্থানের মালিক। ক্ষুদ্রাকারে হলেও 'পাকিস্তান' তাদের পাওনা। তেমনি, ক্ষুদ্রাকারে হলেও 'শিখিস্থান' বা 'খলিস্থান' শিখদের প্রাপ্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ায় অনেকের বিশ্বাস ছিল এ যাত্রা ইংরেজরা

হেরে যাবে। সাম্রাজ্য রাখতে পারবে না। আমার এক সহকর্মী পাঞ্জাবী মুসলিম অফিসার ছুটি থেকে ফিরে এসে বলেন, 'পাঞ্জাবে এক টুকরো লোহা কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। হিন্দু, মুসলমান, শিখ অস্ত্র বানাবার জন্যে কিনে নিচ্ছে। অস্ত্র দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে হিন্দু, মুসলমান, শিখ যে যার হৃত রাজ্য উদ্ধার করবে।' যে রাজ্য একদা ছিল হিন্দুদের, পরে মুসলমানদের, পরে শিখদের।

ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে শিখরাও লড়েনি, মুসলমানরাও লড়েনি, লড়েছিল যারা তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, তারা সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত ছিল না। ক্যাবিনেট মিশন যখন ১৯৪৬ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে কথাবার্তা চালাতে আসেন তখন মুসলিম লীগ আবদার ধরে তাকে পাকিস্তান দিতে হবে, যার মধ্যে থাকবে গোটা পাঞ্জাব। শিখরা বায়না ধরে, মুসলমানরা যদি পাকিস্তান পায় তবে শিখরাও পাবে শিখিস্থান বা খলিস্থান। মুসলমানরা যদি পাকিস্তান না পায় তবে শিখরাও দাবী করবে না শিখিস্থান। ক্যাবিনেট মিশন যে স্কীম তৈরি করেন তাতে ভারত অবিভক্ত থাকবে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা খর্ব করে অবশিষ্ট বিষয় দেওয়া হবে তিনটে গ্রুপ সরকারকে। গ্রুপদের দেওয়া হবে তিনটে আলাদা সংবিধান রচনার ক্ষমতা। ইচ্ছে করলে তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলোর ক্ষমতা খর্ব করতে বা বৃদ্ধি করতে পারবে। জিন্না সাহেব এর মধ্যে পাকিস্তানের বীজ দেখতে পান। কিন্তু শিখরা শিখিস্থান বা খলিস্থানের টিকিও দেখতে পায় না। শেষপর্যন্ত ক্যাবিনেট মিশন স্কীম পরিত্যক্ত হয়। দেশ ও প্রদেশ বিভক্ত হয়। মুসলিম লীগ পেয়ে যায় ক্ষুদ্রাকার পাকিস্তান। অথচ শিখদের বরাতে পূর্ব পাঞ্জাব। যাতে লাহোরও নেই, নানকানা সাহেবও নেই। থাকবার মধ্যে আছে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির। সেই খণ্ডিত প্রদেশও ভোগ করতে হবে হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশে। তখন হিন্দুরাই সেখানে সংখ্যাগুরু।

অসন্তোষের শুরু সেই সময় থেকেই। হিন্দুরা এমন কিছু হারায়নি, মুসলিমরাও এমন কিছু হারায়নি, কিন্তু শিখরা যা হারিয়েছে তার তুলনা নেই। কেন? আমরা কিসে খাটো? ওরা কেন হিন্দুস্থান পাবে, পাকিস্তান পাবে? আমরা কেন শিখিস্থান বা খলিস্তান পাব না? এর চেয়ে বড়ো অন্যায় আর কী হতে পারে? ওদের বোঝানো শক্ত যে হিন্দুস্থান বলতে কেবলমাত্র হিন্দুদের স্থান বোঝায় না। আর ক্ষমতা হস্তান্তরের আইনে হিন্দুস্থান বলে কোনো ডোমিনিয়নের উল্লেখ

পর্যন্ত নেই। উল্লেখ আছে ইণ্ডিয়া আর পাকিস্তানের। ইণ্ডিয়ার সরকারী নাম ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া। হিন্দুস্থান লোকমুখে প্রচলিত বহু শতাব্দীর পুরনো নাম। বাদশাহী আমলেও সে নাম ছিল রাষ্ট্রের নাম। ব্রিটিশ আমলেও সারা দেশের জন্যে হিন্দুস্থানের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। ইকবালের গান আছে, 'হিন্দুস্থান হামারা।'

'হিন্দুরা পেয়েছে হিন্দুস্থান' এটা কিন্তু শিখদের মনে গেঁথে যায়। আর সেটাকে আরো শক্ত করে হিন্দু মহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রভৃতি হিন্দু সংস্থা। এঁদের মূল মন্ত্র হলো হিন্দ, হিন্দু, হিন্দী। মূল মন্ত্রের কোনোখানেই শিখ সম্প্রদায়ের বা পাঞ্জাবী ভাষার বা গুরুমুখী লিপির স্বীকৃতি নেই। অপর পক্ষে শিখদের মূল মন্ত্র হলো, শিখ পন্থ, পাঞ্জাবী ভাষা, গুরুমুখী লিপি। এই দুই মূল মন্ত্রের মধ্যে ফাণ্ডামেন্টাল বিরোধ। শিখধর্ম হিন্দুধর্মের শাখা নয়, পাঞ্জাবী ভাষা হিন্দী ভাষার উপভাষা নয়, গুরুমুখী লিপি দেবনাগরীর বিকৃতি নয়। একপক্ষ যতই বলে 'না' অপর পক্ষ ততই বলে, 'হ্যাঁ'। হিন্দুদের সঙ্গে আর্যসমাজীরাও ছিল আর তাদের কণ্ঠস্বরটা ছিল আরো উচ্চ। দেশভাগের পর যে আদমসুমারি হয় তাতে হিন্দু তথা আর্যসমাজীরা লিখিয়ে নেয় তাদের ভাষা হিন্দী। যদিও বাড়ীতে সবাই বলে পাঞ্জাবী। হিন্দু শিখের দ্বন্দ্বটার শুরু ভাষা নিয়ে, লিপি নিয়ে। ধর্ম নিয়ে নয়। শিখরা দাবী করে ভাষার ভিত্তিতে পাঞ্জাবী সুবা। ধর্মের ভিত্তিতে নয়।

পাঞ্জাবী সুবা পেয়ে শিখরা দেখে তাতে চণ্ডীগড়ই নেই। তখন থেকে তাদের দাবী, চণ্ডীগড় চাই। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চণ্ডীগড় দিতে রাজী, কিন্তু তার পরিবর্তে হরিয়ানাকে দিতে হবে ফাজিলকা আর আবোহর। হিন্দীভাষী অঞ্চল। সেগুলি হরিয়ানার সংলগ্ন নয়, কার্পাস চাষের দরুণ লাভজনক এলাকা, এইসব কারণে পাঞ্জাব সেগুলি ছাড়ে না। যে কারণেই হোক, চণ্ডীগড়ের সঙ্গে ফাজিলকা আর আবোহরের বিনিময় হয় না। ভারত সরকারেরও বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায় না। ভাবখানা যেন এই, থাকুক না চণ্ডীগড় ভারত সরকারের ইউনিয়ন টেরিটরি বা খাসমহল হয়ে। ভুলটা হলো প্রথমে এইখানে। চরমপন্থীরা বিনা শর্তেই চণ্ডীগড় চায়। তার সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চল। যেসব অঞ্চলের লোক শিখদের মতে বাড়ীতে পাঞ্জাবীভাষী, বাইরে হিন্দীভাষী। হিন্দীওয়ালাদের চতুরালি। আর্যসমাজীদের কারসাজি। এরা যদি দুশমনি না করত সকলেই আদমসুমারিতে পাঞ্জাবীভাষী বলে পরিচয় দিত। ভুল

বোঝাবুঝি তুঙ্গে ওঠে।

রাজনীতির খেলাতেও শিখরা ছেলেমানুষ। দিল্লীওয়ালারা তাদের এক হাটে কেনে, আরেক হাটে বেচে। নির্বাচনে হিন্দু ভোট তাদের বিপক্ষে যায়। কিছু শিখ ভোট ভাঙিয়ে নিয়ে কংগ্রেসীরা জেতে। আর কংগ্রেস তো তলে তলে হিন্দু। সেকুলার স্টেট একটা ছদ্মবেশ। মাঝে মাঝে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য শিখ দলগুলিও সেকুলার নয়। তবে তাদের কোনো ছদ্মবেশ নেই। যে কথা সেই কাজ। কংগ্রেসকে তবু সহ্য করা যায়, হিন্দু সাম্প্রদায়িক দলগুলি হিন্দু আধিপত্য কায়েম করতে বদ্ধপরিকর। হিন্দী তাদের প্রধান বাহন। আর সে কী হিন্দী! সাধারণের দুর্বোধ্য। সঙ্গে সঙ্গে দেবনাগরীর মনোপলি। পাঞ্জাবকে উত্তর ভারতের লেজুড় না বানিয়ে ওরা ছাড়বে না। দেশভাগের সময় তো এরকম কোনো কথা ছিল না। হিন্দুস্থানে যোগ দিয়ে কী ভুলই না হয়েছে!

আমরা যদি হিন্দু না হয়ে থাকি, যদি হিন্দীভাষী না হয়ে থাকি, তবে হিন্দ্ কেন আমাদের বাসভূমি হবে? আমাদের বাসভূমি হিন্দের বাইরে। খলিস্থান হামারা, হিন্দুস্থান তুমহারা। এই হলো চরমপন্থীদের মনের কথা। হয়তো মুখের কথাও। অপারেশন ব্লু স্টারের পর থেকে এই ভেদবুদ্ধি বেড়ে গেছে। হিন্দুরাও ইন্দিরা হত্যার পর কয়েক হাজার শিখ হত্যা করে ভেদবুদ্ধিকে বহুগুণিত করেছে। শিখরা ভারতের কোনোখানেই নিরাপদ বোধ করে না। আর হিন্দুরাও কি পাঞ্জাবে নিরাপদ বোধ করে? কাল আর্মি সরিয়ে নিলে পরশু দেখবেন হিন্দুদের সদলবলে পাঞ্জাব ত্যাগ। আবার বদলা, আবার লোক বিনিময়।

ইংরেজীতে ফ্লাশ কথাটার সঙ্গে নর্দমার বা কমোডের মল পরিষ্কারের সম্পর্ক। একদিন একখানি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় স্বর্ণমন্দির থেকে শিখ সন্ত্রাসবাদীদের 'ফ্লাশ আউট' করার সম্পাদকীয় প্রস্তাব দেখে চমকে উঠি। ইংরেজীতে কি আর কোনো শব্দ ছিল না যা অমন অপমানকর নয়? 'ড্রাইভ আউট' ছিল, 'থ্রো আউট' ছিল। এসব ছেড়ে 'ফ্লাশ আউট' কেন। ওটা কি একটা মিলিটারি টার্ম, জানিনে। আমার অত বিদ্যা নেই। পরে একদিন দেখি ভারত সরকারও 'ফ্লাশ আউট' ব্যবহার করেছেন। শুধু কথায় নয়, কাজেও। সন্ত্রাসবাদীদের খেদিয়ে দেননি, খতম করেছেন। এটাই কি 'ফ্লাশ আউট' শব্দটার তাৎপর্য? একেবারে নিকাশ করা? যেমন মল নিকাশ? সম্পাদকও কি নিকাশের পরামর্শ দিয়েছিলেন? ইন্দিরাজীরও কি আদেশ ছিল তাই? অতখানি নির্মমতার

কি সত্যই প্রয়োজন ছিল ? ওরা স্বজাতি না ?

চোর ডাকাত বা খুনী আসামী যদি গির্জায় ঢুকে অ্যাসাইলাম চাইত তা হলে তাকে অ্যাসাইলাম দেবার অধিকার গির্জার ছিল। কিন্তু সে প্রথা ইউরোপে আমেরিকায় বহুদিন আগেই উঠে গেছে। মন্দিরে, মসজিদে বা গুরুদ্বারায় যদি উঠে গিয়ে না থাকে তবে উঠিয়ে দেবার সময় এসেছে। ভিন্দ্রানওয়ালে গোষ্ঠীকে অকাল তখ্‌ত থেকে বহিষ্কারের অধিকার নিশ্চয়ই ভারত রাষ্ট্রের ছিল। সে অধিকার প্রয়োগ করার উপলক্ষ না ঘটলেই ভালো হতো। কিন্তু তেমন একটা উপলক্ষ ঘটল যখন তখন বাধ্য হয়েই পুলিশ পাঠাতে হতো। পুলিশ অপেক্ষাকৃত নিরস্ত্র বলেই আর্মিকে পাঠাতে হলো। খুব একটা বাধা না পেলে আর্মি ট্যাঙ্ক ব্যবহার করত না, গোলা দিয়ে তখতের একাংশ উড়িয়ে দিত না। মানুষও মরত কম। আত্মসমর্পণ করলে একজনও না। যা ঘটে গেল তা সেনাপতিদেরও অপ্রত্যাশিত, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীরও। ঘটনার সংবাদ শুনে আমি আমার সহধর্মিণীকে বলি, 'শিখরা যা চেয়েছে তার চেয়ে বেশী পাবে। মিটমাট আরো কঠিন হলো।'

চুক্তি যাদের সঙ্গে হয়েছে তারা শিখদের মধ্যে নরমপন্থী। সাধারণ নির্বাচনের পর বুঝতে পারা যাবে তাঁদের দৌড় কতদূর। তাঁদের চেয়ে চরমপন্থীদের দৌড় যদি আরো বেশী দূর হয় তবে তাঁদের সঙ্গে সমঝোতার জন্যেও প্রস্তুত হতে হবে। তাঁরা যদি বলেন তাঁরা খলিস্থানের চেয়ে কম কিছুতেই নেবেন না তবে পাঞ্জাবের অশান্তি দশ বিশ বছরও গড়াতে পারে। সম্ভবত সরকারিয়া কমিশন একটা মধ্যপন্থা সুপারিশ করবেন। কমিশন থেকে আমাকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল। আমিই কলকাতার প্রথম সাক্ষী। আমার মতে কেন্দ্রের উচিত রাজ্যগুলিকে আরো কিছু ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া। তার মানে কতক পরিমাণে বিকেন্দ্রীকরণ। পাঞ্জাবের জন্যে আমার সুপারিশ আরও এক কদম বাড়িয়ে। জম্মু ও কাশ্মীরের মতো স্পেশাল স্টেটাস। কারণ পাঞ্জাবও সীমান্ত রাজ্য। আর সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ও হিন্দুপ্রধান ভারতে সংখ্যালঘু। সেকুলার স্টেট হলেও ভারত সব সময় হিন্দু সেন্টিমেণ্ট মেনে চলে। তার একটি কি দুটি বাদে সব ক'টি রাজ্যে গো-হত্যা নিষেধ। গভর্নররা পূজা-পার্বণের উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর একবার করে শঙ্করাচার্যদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা চাই। এক রাজ্যপাল তো তিরুপতিতে গিয়ে মন্দিরের বাইরে গড়াগড়ি দেন।

পাঞ্জাব স্পেশাল স্টেটাস পেলে শিখরা বোধহয় খলিস্থানের জন্যে উদ্‌গ্রীব হবে না। কারণ খলিস্থান হলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে ত্রিশ লক্ষ শিখ আছে তারা সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বনে যাবে। ভারতের নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়া সকলের বেলা সম্ভব নাও হতে পারে। সেটা নির্ভর করবে খলিস্থানের আচরণের উপরে। সে আচরণ যদি পাকিস্তানের মতো শত্রুতাপূর্ণ হয় তবে ভারতের আচরণও অনুরূপ হবে। ভারত নিশ্চয়ই একটি শত্রু রাষ্ট্রের পঞ্চম বাহিনীকে দুধ কলা দিয়ে পুষবে না। খলিস্থানের নাগরিক হয়ে অন্যান্য শিখদেরই বা এমন কী স্বর্গসুখ হবে? ওইটুকু রাষ্ট্র কখনো নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবে না। ইসরায়েলের মতো বিদেশী অর্থসাহায্যনির্ভর হবে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে বিদেশে সৈন্য সরবরাহ করতে বাধ্য হবে। ভারতের নাগরিক হলে বিদেশে লড়তে যাবার বাধ্যবাধকতা থাকত না। খলিস্থানী হলে তার বাধ্যবাধকতা থাকবে। পাকিস্তানী ইতিমধ্যেই বাধ্যবাধকতায় জড়িত। তরুণ শিখদের এসব বুঝিয়ে বলা দরকার। ওরা প্রাণ দিতে ও প্রাণ নিতে তৈরি হচ্ছে এমন একটা রাষ্ট্রের আশায় যা তাদের পূর্ব গৌরবের কণামাত্র ফিরিয়ে আনবে না। ভারতের অঙ্গ হয়ে থাকাই আরো গৌরবের। ভারতকেই সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষ তথা জোটনিরপেক্ষ করে তোলাই অতীব গৌরবের পন্থা।

খলিস্থানের দাবীর ভিতরেই একটা স্ববিরোধ রয়েছে। খলিস্থানের সীমানা যতই প্রসারিত হবে ততই শিখদের সংখ্যানুপাত কমবে, হিন্দুদের বাড়বে। একথা জানা সত্ত্বেও অকালীরা রাজস্থানের একাংশ ও হিমাচল প্রদেশের একাংশ পাঞ্জাবের সঙ্গে জুড়ে দিতে চান। যেখানে শিখদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সেখানে 'রাজ করেগা খলসা' গণতান্ত্রিক উপায়ে সম্ভব নয়। সেখানকার হিন্দু অধিবাসীদের ভোট কেড়ে নিতে হবে কিংবা তাদের রাজ্য থেকে তাড়াতে হবে। বলা বাহুল্য তারা সেটা সহ্য করবে না। ভিতর থেকে বিদ্রোহ করবে, বাইরে থেকে আক্রমণ করবে।

তারপর শিখদের সনাতন বাসভূমি কি কেবলমাত্র ভারতীয় পাঞ্জাবেই নিবদ্ধ? পাকিস্তানী পাঞ্জাবও তো তার অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্তান কি সে অংশ চাইলেই ছেড়ে দেবে? তার জন্যে যুদ্ধ করতে হবে না? অকালীদের কি সেরূপ কোনো সামর্থ্য বা প্রস্তুতি আছে? এটা কি ভুল হবে, যদি বলি তারা ভারতের ভদ্রতার সুযোগ নিতে চায়? আর হিন্দুর দুর্বলতার। যাদের সনাতন বাসভূমির

বৃহত্তর অংশ বাইরে পড়ে আছে ও থাকবে তারা অত ছোট খলিস্থানের স্বপ্ন কেন দেখছে? গণতান্ত্রিক উপায়ে কেমন করেই বা সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে?

ইসরায়েলেরও একই সমস্যা। ইহুদীরা তাদের সনাতন বাসভূমি পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে সমস্তটা জয় করে নিতে পারেনি। সমস্তটা পেলে দেখবে সেখানে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। গণতান্ত্রিক উপায়ে সমস্তটা শাসন করা যাবে না। অগত্যা আরবদের ভোট থেকে বঞ্চিত করতে হবে কিংবা মেরে তাড়িয়ে দিতে হবে। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলেও সেই মারপিট করে আরব খেদানো। আরবরা সে দেশে হাজার দেড়েক বছর হলো বাস করে এসেছে। তারাই বা সহজে হার মানবে কেন? একদিন না একদিন তারাও যুদ্ধ জয় করে হৃত বাসভূমি উদ্ধার করবে। ইহুদীদের বিশ্বাস ভগবান কেবল তাদেরই দিকে। কারণ তারাই তাঁর মনোনীত জাতি।

ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সাঁইত্রিশ বছর কেটে গেছে। কিন্তু বিশ্ব ইহুদী সম্প্রদায়ের সেদেশে গিয়ে বসতি করার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই। গোটা ইসরায়েলে যত ইহুদী বাস করে একমাত্র নিউইয়র্ক শহরে তার চেয়ে বেশী ইহুদীর বাস। আমেরিকার ইহুদীরা নিতান্ত সংখ্যালঘু, অথচ তাদের প্রভাবের পরিসীমা নেই। রেডিও, টেলিভিশন, থিয়েটার, সিনেমা, সংবাদপত্র, গ্রন্থ প্রকাশনা তাদের নিয়ন্ত্রণে। ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্সেও তাদের উচ্চস্থান। সংখ্যালঘু হয়ে তাদের এমন কী ক্ষতি হয়েছে যে তারা ইসরায়েলে গিয়ে বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হবে?

না, এখন পর্যন্ত ইহুদীদের কেউ মার্কিন প্রেসিডেন্ট হননি। ক্যাথলিকদের একজন মাত্র প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। জন কেনেডী। অকালে নিহত হলেন। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন একমাত্র ডিসরেলী, কিন্তু তিনি বংশে ইহুদী হলেও ধর্মে খ্রীস্টান ছিলেন। এ বিষয়ে ফরাসীরা আরো উদার। অস্ট্রিয়ানরাও। সোভিয়েট রাশিয়ানরা আগে ছিল। এখন নয়। এখন ইহুদীদের সন্দেহ করে। এক রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে আরেক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য সহ্য করা যায় না। ইসরায়েল সৃষ্টির পর এই হয়েছে ইহুদীদের সমস্যা। খলিস্থান সৃষ্টি হলে ভারতীয় শিখদেরও একই সমস্যা হবে।

আমার মনে হয় পাকিস্তান যতদিন থাকবে খলিস্থানের স্বপ্নও ততদিন থাকবে। তা যদি হয় তবে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির মতো একদল জঙ্গী শিখও থাকবে, যারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে। আইরিশ

সন্ত্রাসবাদীদের জ্বালায় নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ড এখন স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত, ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। ব্রিটিশ আর্মি সেখানে সমস্তক্ষণ পাহারা দিচ্ছে। তেরো বছর ধরে এই ব্যবস্থা চলছে। কে জানে আরো কতকাল চলবে? আমরা কেউ কি নিশ্চিত হতে পারি যে পাঞ্জাব আবার ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হবে না? সাধারণ নির্বাচনই শেষ কথা নয়।

পাকিস্তান থাকতে এসেছে। ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক পরিপূরকের সম্পর্ক। প্রতিদ্বন্দ্বীর নয়। তার সঙ্গে মিটমাটের কথাই ভাবতে হবে। যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা নয়। পারমাণবিক পাগলামি কারো পক্ষেই মঙ্গলকর নয়, না আমেরিকার পক্ষে, না রাশিয়ার পক্ষে, না ভারতের পক্ষে। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিপূরক। প্রত্যেকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি বা অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হলে পাকিস্তান শিখদের অবাধে তাদের সনাতন বাসভূমিতে ফিরে যেতে দেবে। রাজত্ব করার জন্যে নয়, তীর্থ দর্শনের জন্যে, পূর্বপুরুষের ভিটা কিনে নেবার জন্যে, ছুটি কাটাবার জন্যে, অবসর নিয়ে বৃদ্ধ বয়সে বসবাসের জন্যে। জীবিকা হয়তো সেদেশে জুটবে না, কিন্তু জীবনের সবটাই তো জীবিকা নয়। শিখরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে ইচ্ছা করে তবে পাকিস্তানের বন্ধ দুয়ার খুলে যাবে। তেমনি, এদিকেও খুলে যাবে বন্ধ দুয়ার, ওদিকের মুসলমানরা যদি শিখদের সঙ্গে, হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে চায়।

হিন্দু, মুসলমান ও শিখ এককালে মিলেমিশেই বাস করত। সেসব দিন কি ফিরিয়ে আনা যায় না? যদি ফিরে আসে তা হলে রাজত্বের জন্যে শিখদের অস্থির হতে হবে না। যেখানেই থাকুক রাজত্বের একটা অংশ তারা পাবেই। যেমন ভারতে তেমনি পাকিস্তানে। এ রকম গ্যারান্টি নিশ্চয়ই তাদের দেওয়া যায়। ভারত তো দেবেই, পাকিস্তানও দিতে পারে। মিটমাট যখন হবে তখন এই সমস্যাটারও একটা ফয়সালা হবে। আমরা তার জন্যে যথাসাধ্য করব। সময় লাগবে।

মাউন্টব্যাটেনের মূল পরিকল্পনায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বাংলাদেশের জন্যে একটা ধারা ছিল। জবাহরলালকে সেটা দেখতে দিলে তিনি রেগে যান। তিনি বলেন, "দুটো রাষ্ট্রই যথেষ্ট। তার উপর তৃতীয় একটা রাষ্ট্র হতে দিলে আরো কয়েকটা রাষ্ট্রও হতে দিতে হবে। হায়দরাবাদ, মৈশুর ইত্যাদি দেশীয় রাজ্যগুলিও সেই দাবী তুলবে। আপনি কি ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রপুঞ্জ করতে চান?"

মাউন্টব্যাটেন শশব্যস্ত হয়ে পরিকল্পনা সংশোধন করেন। তা না হলে এতদিনে ভারত বহুধা বিভক্ত হয়ে থাকত। এই কারণে আমরা খলিস্থান বিরোধী। খলিস্থান হলে এক এক করে আরো অনেকগুলি স্থান হবে। ভারত বলকান হবে।

দুঃখের বিষয় ভিন্দ্রানওয়ালের সমর্থক ছিলেন আট হাজার অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার। ভদ্রলোকদের ধারণা ইংরেজরা থাকলে তাঁরা প্রত্যেকেই প্রমোশন পেতেন। খলিস্থান হলে তাঁদের প্রত্যেকের বরাত খুলে যেত। সেই আট হাজারের অন্তঃপরিবর্তন হয়েছে কিনা জানিনে। না হয়ে থাকলে ইণ্ডিয়ান আর্মির ভিতরেই অসন্তোষ ঘনাবে। দেশের সৈন্যদলে কেবল একটি রাজ্যের বা একটি সম্প্রদায়ের বাঁধা আসন থাকতে পারে না। কোটা সিস্টেম আমরা তুলে দিয়েছি। নিজ গুণে যদি শিখরা অধিকতরসংখ্যক চাকরি পান তো কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু বংশসূত্রে বা ধর্মসূত্রে কাউকে অগ্রাধিকার দিলে গণতন্ত্রের মর্যাদা থাকবে না। প্রমোশন তো যোগ্যতা অনুসারে হওয়ার কথা। যোগ্য না হলে হিন্দুরও তো প্রমোশন হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে অবিচার সম্ভবপর। সে রকম কেস আমার অজানা নয়। যাঁর কথা বলছি তিনি বাঙালী হিন্দু।

পার্টিশনের পর দেখা গেল হিন্দু শিখ ভাই-ভাই। হিন্দু মুসলিম দুশমন-দুশমন। শিখ মুসলিম দুশমন-দুশমন। দুশমনদের বিতাড়ন করে ভাই-ভাই মনের আনন্দে বাস করেন। সীমান্তের ওপার থেকে হিন্দু ও শিখ ভাইয়েরা এসে আনন্দবর্ধন করেন। বছর চারেক পরে আদমসুমারি। এক ভাই ঘোষণা করেন তাঁর মাতৃভাষা পাঞ্জাবী। সেইদিন থেকে মনোমালিন্য শুরু। একজন যদি হিন্দীতে কথা বলেন অপরজন বলেন পাঞ্জাবীতে। কমন ল্যাঙ্গুয়েজ নেই। হিন্দীকে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ করলে হিন্দীভাষীদের সুবিধে। ভারত সরকারের সরকারী ভাষা হিন্দী। তা হলে ভারত সরকার ভাষা নিরপেক্ষ কী করে? ক্রমশ ভারত সরকারের উপর সন্দেহ।

এর পরে আসে ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের পুনর্গঠন। তবে পাঞ্জাবের কেন নয়? অথচ পাঞ্জাবী যদি হয় পুনর্গঠনের ভিত্তি হিন্দী কেন বাদ পড়বে? আপসের একমাত্র সূত্র পাঞ্জাব হবে দ্বৈভাষিক। কিছুদিন সেইভাবে চলার পর শিখরা জেদ ধরে অন্যান্য রাজ্য যেমন একভাষী পাঞ্জাবও তেমনি হবে একভাষী। হিন্দুরা বাধা দেয়। লড়াইটা এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় ভাষার লড়াই থেকে

সন্ত্রাসবাদীদের জ্বালায় নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ড এখন স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত, ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। ব্রিটিশ আর্মি সেখানে সমস্তক্ষণ পাহারা দিচ্ছে। তেরো বছর ধরে এই ব্যবস্থা চলছে। কে জানে আরো কতকাল চলবে? আমরা কেউ কি নিশ্চিত হতে পারি যে পাঞ্জাব আবার ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হবে না? সাধারণ নির্বাচনই শেষ কথা নয়।

পাকিস্তান থাকতে এসেছে। ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক পরিপূরকের সম্পর্ক। প্রতিদ্বন্দ্বীর নয়। তার সঙ্গে মিটমাটের কথাই ভাবতে হবে। যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা নয়। পারমাণবিক পাগলামি কারো পক্ষেই মঙ্গলকর নয়, না আমেরিকার পক্ষে, না রাশিয়ার পক্ষে, না ভারতের পক্ষে। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিপূরক। প্রত্যেকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি বা অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হলে পাকিস্তান শিখদের অবাধে তাদের সনাতন বাসভূমিতে ফিরে যেতে দেবে। রাজত্ব করার জন্যে নয়, তীর্থ দর্শনের জন্যে, পূর্বপুরুষের ভিটা কিনে নেবার জন্যে, ছুটি কাটাবার জন্যে, অবসর নিয়ে বৃদ্ধ বয়সে বসবাসের জন্যে। জীবিকা হয়তো সেদেশে জুটবে না, কিন্তু জীবনের সবটাই তো জীবিকা নয়। শিখরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে ইচ্ছা করে তবে পাকিস্তানের বন্ধ দুয়ার খুলে যাবে। তেমনি, এদিকেও খুলে যাবে বন্ধ দুয়ার, ওদিকের মুসলমানরা যদি শিখদের সঙ্গে, হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে চায়।

হিন্দু, মুসলমান ও শিখ এককালে মিলেমিশেই বাস করত। সেসব দিন কি ফিরিয়ে আনা যায় না? যদি ফিরে আসে তা হলে রাজত্বের জন্যে শিখদের অস্থির হতে হবে না। যেখানেই থাকুক রাজত্বের একটা অংশ তারা পাবেই। যেমন ভারতে তেমনি পাকিস্তানে। এ রকম গ্যারান্টি নিশ্চয়ই তাদের দেওয়া যায়। ভারত তো দেবেই, পাকিস্তানও দিতে পারে। মিটমাট যখন হবে তখন এই সমস্যাটারও একটা ফয়সালা হবে। আমরা তার জন্যে যথাসাধ্য করব। সময় লাগবে।

মাউন্টব্যাটেনের মূল পরিকল্পনায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বাংলাদেশের জন্যে একটা ধারা ছিল। জবাহরলালকে সেটা দেখতে দিলে তিনি রেগে যান। তিনি বলেন, "দুটো রাষ্ট্রই যথেষ্ট। তার উপর তৃতীয় একটা রাষ্ট্র হতে দিলে আরো কয়েকটা রাষ্ট্রও হতে দিতে হবে। হায়দরাবাদ, মৈশুর ইত্যাদি দেশীয় রাজ্যগুলিও সেই দাবী তুলবে। আপনি কি ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রপুঞ্জ করতে চান?"

মাউন্টব্যাটেন শশব্যস্ত হয়ে পরিকল্পনা সংশোধন করেন। তা না হলে এতদিনে ভারত বহুধা বিভক্ত হয়ে থাকত। এই কারণে আমরা খলিস্থান বিরোধী। খলিস্থান হলে এক এক করে আরো অনেকগুলি স্থান হবে। ভারত বলকান হবে।

দুঃখের বিষয় ভিন্দ্রানওয়ালের সমর্থক ছিলেন আট হাজার অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার। ভদ্রলোকদের ধারণা ইংরেজরা থাকলে তাঁরা প্রত্যেকেই প্রমোশন পেতেন। খলিস্থান হলে তাঁদের প্রত্যেকের বরাত খুলে যেত। সেই আট হাজারের অন্তঃপরিবর্তন হয়েছে কিনা জানিনে। না হয়ে থাকলে ইণ্ডিয়ান আর্মির ভিতরেই অসন্তোষ ঘনাবে। দেশের সৈন্যদলে কেবল একটি রাজ্যের বা একটি সম্প্রদায়ের বাঁধা আসন থাকতে পারে না। কোটা সিস্টেম আমরা তুলে দিয়েছি। নিজ গুণে যদি শিখরা অধিকতরসংখ্যক চাকরি পান তো কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু বংশসূত্রে বা ধর্মসূত্রে কাউকে অগ্রাধিকার দিলে গণতন্ত্রের মর্যাদা থাকবে না। প্রমোশন তো যোগ্যতা অনুসারে হওয়ার কথা। যোগ্য না হলে হিন্দুরও তো প্রমোশন হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে অবিচার সম্ভবপর। সে রকম কেস আমার অজানা নয়। যাঁর কথা বলছি তিনি বাঙালী হিন্দু।

পার্টিশনের পর দেখা গেল হিন্দু শিখ ভাই-ভাই। হিন্দু মুসলিম দুশমন-দুশমন। শিখ মুসলিম দুশমন-দুশমন। দুশমনদের বিতাড়ন করে ভাই-ভাই মনের আনন্দে বাস করেন। সীমান্তের ওপার থেকে হিন্দু ও শিখ ভাইয়েরা এসে আনন্দবর্ধন করেন। বছর চারেক পরে আদমসুমারি। এক ভাই ঘোষণা করেন তাঁর মাতৃভাষা পাঞ্জাবী। সেইদিন থেকে মনোমালিন্য শুরু। একজন যদি হিন্দীতে কথা বলেন অপরজন বলেন পাঞ্জাবীতে। কমন ল্যাঙ্গুয়েজ নেই! হিন্দীকে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ করলে হিন্দীভাষীদের সুবিধে। ভারত সরকারের সরকারী ভাষা হিন্দী। তা হলে ভারত সরকার ভাষা নিরপেক্ষ কী করে? ক্রমশ ভারত সরকারের উপর সন্দেহ।

এর পরে আসে ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের পুনর্গঠন। তবে পাঞ্জাবের কেন নয়? অথচ পাঞ্জাবী যদি হয় পুনর্গঠনের ভিত্তি হিন্দী কেন বাদ পড়বে? আপসের একমাত্র সূত্র পাঞ্জাব হবে দ্বৈভাষিক। কিছুদিন সেইভাবে চলার পর শিখরা জেদ ধরে অন্যান্য রাজ্য যেমন একভাষী পাঞ্জাবও তেমনি হবে একভাষী। হিন্দুরা বাধা দেয়। লড়াইটা এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় ভাষার লড়াই থেকে

ধর্মের লড়াইতে। যেমন ছিল পার্টিশনের আগে মুসলমানদের সঙ্গে। উপায়ান্তর না দেখে হিন্দীভাষীদের জন্যে আলাদা একটি রাজ্য সৃষ্টি হয়। হরিয়ানা তার নাম। তখনি তাকে আলাদা একটা রাজধানী দিলে ঝগড়া মিটে যেত। তা না করে চণ্ডীগড়কে করা হলো দুই রাজ্যেরই রাজধানী। ভারত সরকারের খাস মহল হওয়ায় হিন্দীই তার খাস ভাষা। ঝগড়া ক্রমশ আরো ঘোরালো হয়। আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবে ঠিক কী ছিল তা নিয়ে নানা মুনির নানা ভাষ্য। সত্য উদ্ধার করা শক্ত ব্যাপার। ভারত সরকার যে বয়ানটি পান তাতে নাকি উল্লেখ ছিল যে শিখরা আলাদা একটি নেশন। শিখ নেশনের জন্যে আলাদা একটি রাজ্য নয়, আলাদা একটি রাষ্ট্র চাই। অর্থাৎ ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে 'সীসেশন'। সাংঘাতিক প্রস্তাব। আমার হাতে যে বয়ানটি এসেছে তাতে ভারত রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছেদ চাওয়া হয়নি। ভারতের ভিতরে থেকেই অধিকতর ক্ষমতা দাবী। এটা এমন কিছু অন্যায় নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও তো কতকটা সেই রকম দাবী। বলকানীকরণ ভালো নয়, বিকেন্দ্রীকরণ মন্দ নয়।

আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর থেকে হিন্দু শিখ দুশমন-দুশমন। রোম নগরী একদিনে নির্মিত হয়নি। সন্ত্রাসবাদও গড়ে ওঠেনি একদিনে। যে যার কাগজে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে বাক্যবাণ বর্ষণ করে। শুরু যার বাক্যবাণ বর্ষণে সারা তার মৃত্যুবাণ বর্ষণে। অনেকদিন আগেই কাগজগুলোকে নিরস্ত্র করা উচিত ছিল। প্রেসের স্বাধীনতা যদি মারাত্মক হয় তবে মানুষকে বাঁচানোর জন্যে তা করা কর্তব্য। আমি কি দেখিনি কী লেখা হতো বাংলা কাগজে পার্টিশনের আগে ও পরে? আশা করি রাজীব-লঙ্গোয়াল চুক্তি হিন্দু-শিখের মধ্যে সদ্‌ভাব ফিরিয়ে আনবে। তবে সেই যে একটা কথা আছে, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগের পর চেমসফোর্ড বলেছিলেন, ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট। এর উত্তরে মালবীয়জী বলেন, ফরগিভ আমরা নিশ্চয় করব, কিন্তু ফরগেট কখনো না। স্বর্ণমন্দিরের অকাল তখ্‌ত সম্বন্ধেও শিখদের মুখে একই কথা। চাই আরোগ্যকারী স্পর্শ।

বড়ো ব্যথা পেলুম একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়ে। একজন শিখ ভদ্রলোক বলেছেন, "হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে যেমন করে হজম করে ফেলেছে শিখধর্মকেও তেমনি করে হজম করে ফেলবে। করবে সুচতুর উপায়ে।" ভদ্রলোক ভয় করেন হিন্দুদের সহজাত চাতুরীকে। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে মৌলানা শওকত

আলীও বলেছিলেন, "হিন্দুরা বৌদ্ধদের যেভাবে শেষ করেছে মুসলমানদেরও সেইভাবে শেষ করবে।" পঞ্চাশ বছর পূর্বে তখনকার দিনের প্রখ্যাত প্রবন্ধকার মহম্মদ ওয়াজেদ আলী (এস. ওয়াজেদ আলী নন) 'বুলবুল' পত্রিকায় যা লেখেন তার মর্ম, হিন্দুধর্ম এমন সর্বগ্রাসী যে হিন্দু ভারতে ইসলাম নিরাপদ নয়। আমি তার প্রতিবাদ করি। ইসলামই তো হিন্দুদের দীক্ষিত করে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধর্ম হয়েছে। হিন্দুরা সমাজসংস্কার না করলে একদিন ভারতেও হতে পারে, এটাই ছিল আমার বক্তব্যের মর্ম।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছি হিন্দু মুসলিম সমস্যাকে সমাধানের অতীত করে আইডেনটিটি হারানোর ভাবনা ও ভয়। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে সর্বময় ক্ষমতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ই সংবিধান রচনা করে ও নিজের স্বার্থে প্রয়োগ করে। সংখ্যালঘু একটু একটু করে তার বৈশিষ্ট্য হারায়। মহম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেবকে আমি শঙ্কামুক্ত করতে চেয়েছিলুম। পরে দেখা গেল আমিও কম শঙ্কিত নই। মুসলিম সংখ্যা যদি আরো বেড়ে যায় তবে হিন্দুরাও আজ বাংলাদেশে, কাল আসামে, পরে অন্যত্র সংখ্যালঘু হতে পারে। মহাত্মা গান্ধী একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আজ যদি আমরা হরিজন সমস্যার সমাধান না করি তবে আর পঁচিশ বছর পরে হিন্দু সমাজ ভেঙে যাবে।' র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদে তফশীলি হিন্দুদের সেপারেট ইলেকটোরেট দেওয়া হয়। গান্ধীজী এর প্রতিবাদে মৃত্যুপণ অনশন করেন। তার ফলে আম্বেদকরের সঙ্গে তাঁর পুণা চুক্তি হয়। সেপারেট ইলেকটোরেট যায়। হিন্দু সমাজের সংহতি রক্ষা হয়। কিন্তু গান্ধীজীর আশঙ্কা তবু যায় না। হরিজন সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত করতে হলে জাতপাতের মূলেও কুঠার হানতে হবে। তিনি বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে হরিজনদের বিয়ে দেন। ব্রাহ্মণ কন্যা, হরিজন বর। কিংবা তার বিপরীত।

এতে মুসলিম মোল্লাদের ঐতিহাসিক মিশন বাধা পায়। হরিজনরা যদি মুসলমান না হয় তো ভারতে মুসলমানদের বৃদ্ধি হবে কী করে? উল্টে ক্ষয় হবে, যদি আর্যসমাজীরা ধর্মান্তরিত মুসলমানদের শুদ্ধি করে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আর মহাত্মা গান্ধীর সামাজিক আন্দোলন মুসলমানদের পাকিস্তানের অভিমুখে এগিয়ে দেয়। একমাত্র পাকিস্তানেই ইসলাম নিরাপদ হতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুর নিরাপত্তার কী ভরসা? এর উত্তর দিতে গিয়ে পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব। এখন শিখদের মনে অনুরূপ ভয়

ও ভাবনা। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মাঝখানে থেকে তাদের আইডেনটিটি কতদিন নিরাপদ? অখণ্ড ভারতে শিখরা শতকরা দুই সংখ্যক ছিল, খণ্ডিত ভারতে বোধহয় চার। ছলে বলে কৌশলে হিন্দুরা শিখদের ক্রমে ক্রমে হিন্দুর থেকে অভিন্ন করতে পারে। হিন্দুদের বোলচাল শুনলে সে রকম মনে হওয়া বিচিত্র নয়। ইউনিটি আর ডাইভার্সিটি দুই পাল্লাই সমান রাখতে হবে। ধর্মে ও সমাজে ও রাষ্ট্রে। ক্ষুরধার পন্থা।'

১৯৮৪

জ্বলন্ত প্রশ্ন : কাশ্মীর

ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলিকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, ব্যতিক্রম শুধু জম্মু ও কাশ্মীরের বেলা। জম্মু ও কাশ্মীরকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ মর্যাদা, স্পেশ্যাল স্টেটাস। সে তার নিজস্ব সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ভারতীয় ইউনিয়নের আর কোনও অঙ্গরাজ্য এই অধিকারে অধিকারী নয়। তার ফলে ভারতের সাধারণ নাগরিকরা সে রাজ্যে গিয়ে অবাধে জমি খরিদ, বাড়ি তৈরি, চাকরির প্রতিযোগিতায় যোগদান ইত্যাদি করতে পারে না। মালপত্র আমদানি রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়েও বিধিনিষেধ আছে। কারখানা স্থাপন, হোটেল নির্মাণ প্রভৃতির উপরেও। সব খুঁটিনাটি আমার জানা নেই। তবে ওই রাজ্য সরকার যে অন্যান্য রাজ্য সরকারের চেয়ে আরও ক্ষমতাসম্পন্ন এটা সন্দেহাতীত।

জম্মু ও কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধানে হস্তক্ষেপ না করে ইউনিয়নের পার্লামেণ্ট খুশিমতো আইন পাশ করে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সরকারের ক্ষমতা খর্ব করতে পারে না। তেমন কাজ করলে জম্মু ও কাশ্মীরের নাগরিকদেরও অধিকার খর্ব করা হয়। পাকিস্তান এখনো জম্মু ও কাশ্মীরের উপর তার মৌল দাবি ছাড়েনি। আর সে রাজ্যের কতক অংশ তো এখনও পকিস্তানের দখলে। সেখানকার অধিবাসীরা নাকি স্বাধীন কাশ্মীর চায়। এ দাবিও ১৯৪৭ সাল থেকে অব্যাহত। ইউনিয়নভুক্ত অংশেও কিছু লোক আছে যারা স্বাধীন কাশ্মীরের পক্ষপাতী। পাকিস্তান যদি সে দাবির অন্তরায় না হতো, যদি আজাদ কাশ্মীরীদের কার্যত পরাধীন করে না রাখত, তবে ঘটনার স্রোত এতদিনে অন্য খাতে প্রবাহিত হতো। পাকিস্তানের মতলব জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্তটাই গ্রাস করা, তাকে বিশেষ মর্যাদা না দেওয়া, তার স্বতন্ত্র সংবিধানকে মান্য না করা, তাকে গণতন্ত্র থেকে

বঞ্চিত করা। কাশ্মীরী মুসলমানরা এটা হাড়ে হাড়ে বোঝে বলেই পাকিস্তানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ইসলামী প্রচারে ভুলছে না। কিন্তু এর থেকে যেন কেউ ধরে না নেন যে, কাশ্মীরী মুসলমানরা কোনো অবস্থাতেই ভারতের সঙ্গে বিচ্ছেদ দাবি করবে না। ইউনিয়ন সরকার তাদের রাজ্যের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এক এক করে লোপ করেছেন। করার কায়দাটা জোর জুলুম নয়। শেখ আবদুল্লাকে কৌশলে অপসারণ করে গোলাম মহম্মদকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসানো। সদর-ই-রিয়াসৎ করণ সিংকে কৌশলে অপসারণ করে মনোনীত গভর্নর বসানো। জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের জিতিয়ে দিয়ে তাঁদের দ্বারা আইন-কানুন পাল্টানো। গত নির্বাচনে যদি কংগ্রেস প্রার্থীদের জয় হতো তা হলে আজকের পরিস্থিতির উদয়ই হতো না।

দেখা গেল কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেটা প্রধানত জম্মুতে। কাশ্মীর উপত্যকায় নয়। সেখানে ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রার্থীদের জয়জয়কার। সমগ্র রাজ্যে তাঁদের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং সরকার গঠনের অধিকারও তাঁদেরই। ফারুক আবদুল্লার নেতৃত্বে তাঁরা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেন। এটাই গণতন্ত্রসম্মত প্রথা। গভর্নর ব্রিজকুমার নেহরু থাকতে প্রথাবিরুদ্ধ কোনো কাজ হয়নি। পরাজিত পক্ষকে পাঁচ বছর সবুর করতে হবে। তখন যদি জনমত তাঁদের দিকে যায় তাঁরাই নির্বাচনে জিতে সরকার চালাবেন। তাঁরা কিন্তু ততদিন সবুর করতে নারাজ। তাঁদের দলের নিখিল ভারতীয় প্রেসিডেন্ট যিনি তিনিই নিখিল ভারতীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু দলের প্রেসিডেন্ট হিসাবে অসীম। তিনি যদি ইচ্ছা করেন পাকা ঘুঁটিকেও দলের স্বার্থে কাঁচিয়ে দিতে পারেন, তার পরে বলতে পারেন সেটা দেশের স্বার্থে। গভর্নর ব্রিজকুমার নেহরু যখন বদলী হয়ে গুজরাটে যান আর দিল্লীর লেফটেন্যান্ট গভর্নর জগমোহন তাঁর পদে বহাল হন তখনি আঁচ করতে পারা যাচ্ছিল যে এর পরে আসছে এক মোক্ষম চাল। কোনও একটা অজুহাতে ফারুক আবদুল্লাকে বরখাস্ত করা হবে, কিন্তু তাঁর আসন কি শূন্য থাকবে? স্বয়ং গভর্নর করবেন রাজ্যভার গ্রহণ না কোনও এক কংগ্রেস নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী পদে মাস ছয়েক রাখা হবে? ইতিমধ্যে তিনি আইনসভা ডেকে তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করবেন? কী করে তা সম্ভব? কেন আয়ারাম ও গয়ারামদের সৌজন্যে। মন্ত্রীসংখ্যা তো সীমাবদ্ধ নয়, যেমন ছিল ব্রিটিশ আমলে। যত ইচ্ছা তত মন্ত্রী বানাও। উপমন্ত্রী বানাও। মিনিস্টার অব

স্টেট বলে একটা পদও সৃষ্টি হয়েছে, আর কিছু না হোক পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি তো আছে। শতকরা একান্ন জন একজোট হলে সরকার গঠন করা যায়। সেই একান্ন জনকেই একভাবে না একভাবে বিভিন্ন পদে বসানো যায়। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

ফারুক আবদুল্লা ছেলেমানুষ। বিলেতেই বসবাস করছিলেন। বৌ মেমসাহেব। পিতার সুপুত্রের মতো দেশে ফিরে এসে পিতার যুবরাজ হন। এর বহু নজির আছে দেশে ও বিদেশে। তাইওয়ানে আমরা কী দেখছি, উত্তর কোরিয়ায় কী হবে শোনা যাচ্ছে?

আরো আগে শেখ সাহেব নাকি তাঁর জামাতাকে কথা দিয়েছিলেন যে শ্বশুরের পদে জামাতাই হবেন উত্তরাধিকারী। ফারুক উড়ে এসে জুড়ে বসায় তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন তেমন একজনকে কংগ্রেসের দরকার ছিল। তাঁরও দরকার ছিল কংগ্রেসের ভোট। দুই আর দুইয়ে মিলে চার হয়, যদি ফারুকের সমর্থকদের কয়েকজনকে কোনও এক মহান নীতির দোহাই দিয়ে শিবির বদল করানো যায়। কাশ্মীরে সেই নীতি হচ্ছে ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতি সন্দেহাতীত আনুগত্য। কাশ্মীর উপত্যকার এমন বহু লোক আছে যারা তলে তলে পাকিস্তানের পক্ষপাতী।

আবার এমন লোকও আছে যারা স্বপ্ন দেখে স্বাধীন কাশ্মীরের। মোল্লা শ্রেণীর দৌড় পাকিস্তানের অভিমুখে। আর ছাত্র মহল ভারতীয় বা পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের চেয়ে কাশ্মীরী জাতীয়বাদকেই আপনার মনে করে। একই মনোভাব লক্ষ করা যাচ্ছে আসামে, মণিপুরে, পাঞ্জাবে, ত্রিপুরায়, নাগাল্যাণ্ডে মিজোরামে। এর থেকেই এসেছে বাংলাদেশ। সিন্ধুপ্রদেশেও এ মনোভাব সক্রিয়। পাকিস্তান আবার ভাঙতে পারে। পাখতুনিস্থান ও বেলুচিস্থান বেরিয়ে যেতে পারে।

শিখদের মধ্যে যারা ভারত ভক্ত তাঁরাও বলছেন তাঁরা চান কাশ্মীরের মতো পাঞ্জাবের জন্যেও স্পেশ্যাল স্টেটাস। শিখদের জন্যেও হরিজনদের মতো স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এর জন্যে সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে। কে এতে রাজী হবে? হতাশ হয়ে নরমপন্থীরাও চরমপন্থী হবেন। প্রত্যন্ত প্রদেশে যেসব রাজ্য অবস্থিত সেসব রাজ্যে এই মনোভাব ঘনীভূত হচ্ছে। যাঁরা আমাদের সীমান্তরক্ষী তাঁদেরই এই অবাস্তব দাবি। সেইজন্যে সন্দেহ হয় যে সীমান্তের ওপার থেকে এপারে ষড়যন্ত্রের মাকড়সা তার জাল বিস্তার করেছে ও তাতে এপারের রাজনীতিকরাও

জেনে বা না জেনে জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু সন্দেহ তো প্রমাণ নয়। যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। অপবাদ দিয়ে পদচ্যুত করলেই হলো।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাস ও অবস্থান বিবেচনা করলে তার জন্যে পৃথক ব্যবস্থা না করে উপায় ছিল না। ওটি ছিল একটি দেশীয় রাজ্য। ব্রিটিশ ভারতের বাইরে। ক্ষমতার হস্তান্তরের সময় সে রাজ্যের হস্তান্তর হয়নি। ব্রিটিশ রাজ-চক্রবর্তী তার মাথার উপর প্যারামাউন্টসির ছত্র ধরেছিলেন। পনেরোই আগস্ট সেই ছত্রটি অপসৃত হয়। তার ফলে জম্মু ও কাশ্মীরও হয় ভারত ও পাকিস্তানেরই মতো স্বাধীন। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যও তাই। স্বাধীন ভারত বা স্বাধীন পাকিস্তান যদি তাদের গায়ের জোরে দখল করে তবে তাদের স্বাধীনতা কদ্দিন টিকবে? ব্রিটেন যদি তার সৈন্যসামন্ত সরিয়ে নেয় তাদের রক্ষা করবে কে? তাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভারত ও পাকিস্তান এ দুটি রাষ্ট্রের একটির সঙ্গে যোগ দেওয়া, যার পক্ষে যে নিকটতর। শেষ রাজপ্রতিনিধি হিসাবে মাউন্টব্যাটেন প্রত্যেককে পরামর্শ দেন তিনটি বিষয়ে কর্তৃত্ব ভারত বা পাকিস্তানকে সমর্পণ করতে। যুদ্ধবিগ্রহ, বৈদেশিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ। তার মধ্যে পড়ে রেলপথ, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি। এ তিনটিকে বাদ দিলে যেসব বিষয় বাকী থাকে সেসব থাকবে দেশীয় রাজ্য সরকারের হাতে। এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে প্রায় সব ক'টি রাজ্যই ভারতে বা পাকিস্তানে যোগ দেয়। বাকী থাকে হায়দরাবাদ ও জম্মু ও কাশ্মীর। জুনাগড়কে আমি ধরছিনে। জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানেই যোগ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর হিন্দু প্রজারা তাতে বাদ সাধে। সমস্যা হলো দক্ষিণে নিজামকে নিয়ে আর উত্তরে মহারাজা হরি সিংকে নিয়ে। এঁরা চান স্বাধীন হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মতো ডোমিনিয়ন স্টেটাস। কিন্তু আরো দুটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করতে কেউ রাজী নয়। না ইংরেজ না কংগ্রেস না মুসলিম লীগ। বিপদে-আপদে ব্রিটিশ সৈন্য কোন পথ দিয়ে হায়দরাবাদে আসত? কিংবা কাশ্মীরে? যে পথ দিয়ে আসতে চাইত সে পথ ভারতের বা পাকিস্তানের এলাকায়। তারা কেন পথ ছাড়বে?

কিন্তু নিজাম ও মহারাজা সমান অবুঝ। হায়দরাবাদের যেরকম অবস্থান তাতে তার দ্বিতীয় কোনো বিকল্প ছিল না। তাকে বাধ্য হয়ে ভারতেই যোগ দিতে হতো। ভারতের নেতারাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভারত রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। হিন্দু রাষ্ট্র নয়। নিজাম রাজ্যের মুসলমান প্রজাদের সমস্ত অধিকারই সুরক্ষিত হবে। তবে নিজামের ক্ষমতা নির্ভর করবে প্রজাদের ইচ্ছার

উপরে । যেমন প্রত্যেকটি দেশীয় রাজ্যে। নিজাম মাউণ্টব্যাটেনের সুপরামর্শ গ্রাহ্য করেন না। তাঁর যুক্তি ব্রিটিশরাজ তাঁর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ। তিনি ব্রিটেনের মিত্র। কংগ্রেস যদি ব্রিটেনের উত্তরাধিকারী হয় কংগ্রেসও সন্ধিবদ্ধ। তিনি তাঁর যুক্তিতে অটল। মাউণ্টব্যাটেনকে অবশ্য রাজপ্রতিনিধি বলে স্বীকার করেন, তা বলে তাঁর পরামর্শ শুনতে বাধ্য নন। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক।

মাউণ্টব্যাটেনকে গভর্নর জেনারেল পদে রাখা হয় স্বাধীন ভারত সরকারের অনুরোধে। পনেরোই আগস্টের পর তিনি আর ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি নন। তিনি দেশে ফেরার জন্যে ছটফট করছিলেন, ব্রিটিশ নেভীর উচ্চতম পদ তাঁর কাছে আরো মূল্যবান। তিনি অনুরোধ এড়াতে না পেরে থেকে যান, কিন্তু নিজামের মনোভাব একটুও বদলায় না। তাঁর বিদায়ের পর ভারতীয় সৈন্য নিজাম রাজ্য গায়ের জোরে দখল করে। নিজাম তিনটি বিষয় সমর্পণ করেন।

কাশ্মীরের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের যোগসূত্রই থাকত না, যদি না র‍্যাডক্লিফ তাঁর রোয়েদাদে গুরুদাসপুর জেলার একাংশ পূর্ব পাঞ্জাবকে দিতেন। আগে সেখানে কাশ্মীরে যাবার রেলপথ বা রাজপথ ছিল না। এসব ছিল পাকিস্তানভুক্ত পশ্চিম পাঞ্জাবে। মহারাজার পক্ষে পাকিস্তানে যোগ দেওয়াই ছিল প্রশস্ত পন্থা। র‍্যাডক্লিফ সদয় না হলে একমাত্র পন্থা। মহারাজা ভারত তথা পাকিস্তান উভয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালান, কিন্তু কারো কোলে ঝাঁপ দেন না। সেই তিনটি বিষয় তিনি কারো হতে সমর্পণ করবেন না। কেন তবে কেউ তাঁকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেবে? পাকিস্তান স্বনামে আক্রমণ করে না, কিন্তু বেনামীতে উপজাতীয় আক্রমণকারীদের মদত দেয়। তারা যখন শ্রীনগর গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছে তখন মহারাজার টনক নড়ে। তিনি ভারতকে অনুরোধ করেন তাঁর রাজ্য রক্ষা করতে। ভারত এই শর্তে রাজী হয় যে মহারাজাকে ভারতে যোগ দিতে হবে, সেই মর্মে দলিল সই করতে হবে। তিনি শেষ মুহূর্তে তাই করেন। ভারত শেষ মুহূর্তে সৈন্য পাঠায়। পাঠায় আকাশ পথে। রাজ্য রক্ষা পায়। সেই সংকটে কাশ্মীরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননায়ক শেখ আবদুল্লা ভারতের পক্ষ নেন। সুতরাং সিদ্ধান্তটা যদিও মহারাজার তবু তাতে তাঁর প্রজাদেরও সম্মতি ছিল। কিন্তু সেটার জন্যেও একটা ফর্মালিটির প্রয়োজন। কারণ প্রজাদের বেশীর ভাগই মুসলমান। আর মহারাজা হিন্দু। ভারত ও পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতেই দু'ভাগ হয়। ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রদেশ হয়ে

থাকলে জম্মু ও কাশ্মীর পাকিস্তানের ভাগেই পড়ত। পাঞ্জাব দু'ভাগ না হলে এটাই ছিল তার নিয়তি। র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ পূর্ব পাঞ্জাবের সঙ্গে যোগসূত্র না রাখলে শুধুমাত্র আকাশপথে সৈন্য পাঠিয়েই ভারত কাশ্মীর অধিকার করতে বা রক্ষা করতে পারত না। স্থলপথেরও প্রয়োজন ছিল। নইলে বিমানকে উড়তে হতো পাকিস্তানের উপর দিয়ে। পাকিস্তান তার এয়ার স্পেস লঙ্ঘন করতে দিত না। গুলী করে প্লেন নামাত।

জম্মু ও কাশ্মীর যে ভারতভুক্ত হলো এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার। একটা ব্যতিক্রমও বটে। গায়ের জোরে কেউ একে স্থায়িত্ব দিতে পারত না। সঙ্গে থাকা চাই ন্যায়ের জোর। ন্যায়টা এইখানে যে ব্রিটিশ সরকারের নীতি অনুসারে রাজার যোগদানই রাজ্যের যোগদান। কিন্তু প্রজাদেরও তো ঘোরতর আপত্তি থাকতে পারে। সুতরাং প্রজা প্রতিনিধি শেখ আবদুল্লার সম্মতিরও প্রয়োজন ছিল। সে সময় নেহরু প্লেবিসাইটেরও প্রতিশ্রুতি দেন, যাতে গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্লেবিসাইটের প্রতিশ্রুতিই হয়ে দাঁড়ায় সর্বপ্রকার জটিলতার আধার। ব্রিটিশ রা প্রতিনিধি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছিলেন যে ভারত ও পাকিস্তান ছাড়া তৃতীয় কোন ডোমিনিয়ন হবে না। নেহরু তাঁকে দিয়ে সেটা স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলেন। জিন্নাও তাই চেয়েছিলেন। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কাশ্মীর তাঁদের কারো কল্পনায় ছিল না। সেটা ছিল মহারাজা হরি সিংয়ের কল্পনায়। পরে দেখা গেল তাঁর পরম শত্রু শেখ আবদুল্লারও কল্পনায়। প্লেবিসাইট হলে ভোটার কি ভারত ও পাকিস্তান এই দুটির একটিকে বেছে নিত, না ভারত, পাকিস্তান ও কাশ্মীর এই তিনটির একটিকে বেছে নিত? দুটির একটিকে, তিনটির একটিকে নয়। অথচ আবদুল্লার দলের বাসনা তিনটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা।

নেহরুর সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য ছিল। শোনা গেল আবদুল্লা মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেও কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্যে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। এর সত্য মিথ্যা এখনো অপ্রমাণিত। সন্দেহের যথেষ্ট কারণ থাকায় তাঁকে সরানো হয়, সঙ্গে সঙ্গে বন্দীও করা হয়। তাঁর তরফ থেকে বলার ছিল যে ভারত তিনটি মাত্র বিষয় নিয়েই সন্তুষ্ট নয়, ছলে-বলে কৌশলে আরো অনেকগুলি বিষয় করায়ত্ত করেছে। মহারাজা তো সেসব হারিয়েছেনই, তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলও সেসব হারিয়েছেন। আবদুল্লার প্রাক্তন মন্ত্রীরা কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশে ইউনিয়ন সরকারকে সর্বশক্তিমান করতে রাজী হতে পারেন। কিন্তু আবদুল্লা কেন

করবেন? কাশ্মীরের প্রজাসাধারণ কেন করবে? ভারত রক্ষক হয়ে ঢুকেছে। ভক্ষক হয়ে বসেছে। কাশ্মীরকে পরিণত করেছে একটা ভারতীয় প্রদেশে। সে তো তা নয়।

শেখ আবদুল্লাকে শত্রু করা মানে কাশ্মীরী মুসলমানদেরও শত্রু করা। নেহরু সেটা চান নি। তাই তাদের প্লেবিসাইট না দিলেও স্পেশ্যাল স্টেটাস দেন। ভারতীয় সংবিধানে কাশ্মীরের স্পেশ্যাল স্টেটাস লিপিবদ্ধ হয়। তা ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতার অঙ্গীকার তো ছিলই। ভারত সেকুলার স্টেট। হিন্দু রাষ্ট্র নয়। হবেও না। হিন্দু রাষ্ট্র হলে কাশ্মীরী মুসলমানরা কিছুতেই ভারতে যোগদান মেনে নিত না, ভবিষ্যতেও মেনে নেবে না। স্পেশ্যাল স্টেটাসও তাদের দিক থেকে একটা সনদ। সেটা রদ করলে তাদের প্রতিবাদ তুঙ্গে উঠবে। কাশ্মীর হবে অশাসনীয়। তার একাংশ পাকিস্তানে অবস্থিত বলে ভারতের পক্ষে সেটা বিপজ্জনক।

নেহরু নিজে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ বংশীয়। কাশ্মীরের জন্যে তিনি এত কিছু করেন যে তাঁর নিজের দলের লোকেরাই বলতে আরম্ভ করে, "কী দরকার ছিল কাশ্মীর অধিকার করার? মহারাজা যদি পাকিস্তানে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিতেন তা হলে আমরাও সেটা মেনে নিতুম। এখন দেখছি পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তহীন বিবাদ অথচ কাশ্মীরীরাও কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। সাপের ছুঁচো গেলা হয়েছে। না পারে গিলতে না ওগরাতে।" নেহরুর ভরসা ছিলেন আবদুল্লা, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ক্রমাগত খর্ব হওয়ায় তিনিও ক্ষুব্ধ। তিনি খতিয়ে দেখছেন কাশ্মীরের একদিকে ভারত, আরেক দিকে পাকিস্তান, আরেক দিকে তিব্বত তথা চীন, আরেক দিকে আফগানিস্থান তথা সোভিয়েট ইউনিয়ন। অবস্থানঘটিত এ রকম গুরুত্ব একমাত্র সুইটজারল্যাণ্ডেরই আছে। কাশ্মীরের প্রকৃত মর্যাদা হবে সুইটজারল্যাণ্ডের মর্যাদা। সে হবে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ। সারা দুনিয়ার টুরিস্ট সেণ্টার। ভারতে যোগ না দিলেই হতো। তিনি ভুলে গেলেন যে পাকিস্তান বেনামীতে জম্মু ও কাশ্মীর দখল করলে মহারাজা পাকিস্তানে যোগ দিতেন। আবদুল্লাও সেটা মেনে নিতেন। নয়তো ক্ষমতায় আসতেন না।

এটাও তিনি বুঝতেন যে পাকিস্তানে যোগ দিলে তাঁর রাজ্যের লেশমাত্র স্বাধীনতা থাকত না। পাকিস্তান যুদ্ধে নামলে কাশ্মীরের একই বিপদ। তিনি যে পাকিস্তানঘেঁষা তাও নয়। পাকিস্তানও যে তাঁকে পছন্দ করত তাও নয়। পাকিস্তানের পছন্দ ন্যাশনাল কনফারেন্স নয়, মুসলিম কনফারেন্স। এই ঘোলা

জলে মাছ ধরতে ঢোকে হিন্দু মহাসভা। তার দাবি কাশ্মীরকে সর্বতোভাবে ভারতভুক্ত করতে হবে। ভারতের হিন্দুরা সেখানে অবাধে যেতে আসতে পারবে, বসবাস করতে পারবে, বাণিজ্য করতে পারবে। মেজরিটি হতে পারবে। স্পেশ্যাল স্টেটাস কেন? সেটা রদ করো।

নেহরু নানা দিক থেকে বিব্রত হন। আবদুল্লার আস্থা হারান। অপর পক্ষে আবদুল্লাও হারান নেহরুর বিশ্বাস। গোলাম মহম্মদ প্রমুখ সুযোগসন্ধানী এর সুযোগ নিয়ে গদীতে বসেন। এতকাল পরে আবার সেই দৃশ্য। আরেক আবদুল্লা গদীচ্যুত। আরেক গোলাম মহম্মদ গদীনসীন।

এত বড়ো একটা মহাদেশতুল্য দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যে কংগ্রেস শাসন ছাড়া আর কোনও শাসন চলবে না এটা ইতিহাসের লিখন হতে পারে না। ইংরেজের বেলা যা সম্ভব হয়েছিল কংগ্রেসের বেলা তা সম্ভব হয়নি, মুসলিম লীগ হয়েছে তার ঘোরতর বিরোধী, তাই একই উচ্চাভিলাষ যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুনরায় প্রকট হয় তার পরিণাম আরো বেশী সংহতি নয়, তার বিপরীত। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের শিখরাও কাশ্মীরের দেখাদেখি তাদের রাজ্যের জন্যে স্পেশ্যাল স্টেটাস চাইতে আরম্ভ করেছে। যারা উগ্রপন্থী নয় তাদেরই এ দাবি। আর যারা উগ্রপন্থী তাদের দাবি পাকিস্তানের দেখাদেখি খলিস্থান বা শিখিস্থান। এর জন্যে তারা অস্ত্র ধারণ করেছে ও করবে। বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চক্রান্ত করতেও তাদের বিবেকে বাধছে না। ভারতের ইতিহাসে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনার দৃষ্টান্ত এই প্রথম নয়। কুমীরকে এঁরা যতটা নিঃস্বার্থ ভাবছেন ততটা সে নয়। ভারতকে দুর্বল করে তার উপর চাপ দিতে দিতে সে তাকে তাঁবেদারে পরিণত করবে। দেশের সামূহিক স্বার্থের প্রতি এই উদাসীনতা বিস্ময়কর। খলিস্থান তার তথাকথিত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে কদ্দিন? ভারত যদি মরে কে বাঁচবে? ভারত যদি বাঁচে কে মরবে? তুমি হিন্দুই হও আর মুসলমানই হও আর শিখই হও, পাঞ্জাবীই হও আর অসমীয়াই হও আর মণিপুরীই হও, ভারতকে দুর্বল করলে তুমি স্বাধীনতাকেও বিপন্ন করবে। কংগ্রেসের উপর তোমার বিরাগ থাকতে পারে, থাকা স্বাভাবিক। 'একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান চিরকাল নিখিলের অভ্রান্ত বিধান।' বলে গেছেন কবি। কংগ্রেস যদি সর্বগ্রাসী হতে যায় তবে কংগ্রেসই পশ্চাতাবে। কিন্তু কংগ্রেস আর ভারত তো এক নয়। ভারত তার চেয়ে অনেক বড়ো।

ফারুক জাতীয়তাবিরোধী, গোলাম মহম্মদ ষোল আনা জাতীয়তাবাদী

এগুলো কোনো যুক্তিই নয়। কেন্দ্রের সঙ্গে বনিবনা হলে ফারুকও হতেন ষোল আনা জাতীয়তাবাদী। যে কোন কারণেই হোক বনিবনায় চিড় ধরেছে। আমরা রাজনীতিক নই। রাজনীতি থেকে দূরে দূরেই থাকি। কিন্তু অমৃতসরের অকাল তখ্‌তের মতো সংঘর্ষ দেখলে বিচলিত হই। কাশ্মীরে যদি সে রকম কিছু ঘটে তবে তেমনি বিচলিত হব। তখন হয়তো শুনব যে পাকিস্তানের প্ররোচনায় সে জিনিস ঘটেছে। পাকিস্তান যে তিন দশক ধরে নিরবচ্ছিন্ন শত্রুতা করছে সেকথা কে না জানে? কাশ্মীর না নিয়ে সে ছাড়বে না। তার জন্যে পারমাণবিক অস্ত্রও নাকি নির্মাণ করবে। ভারতেও একদল বুদ্ধিমান আছেন তাঁরা পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র না বানিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন না। এতে অর্থেরও অপচয়, বুদ্ধিবৃত্তিরও অপব্যবহার, এটা ইসলাম বা হিন্দুধর্মও নয়। নিছক পারিবারিক বিবাদে আমরা যে একই পরিবার এ সত্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে। পরিণাম কখনো শুভ হতে পারে না। বিজিত-বিজেতা উভয়েই ধ্বংস হবে।

সংবিধান সংশোধন না করে কাউকেই স্পেশ্যাল স্টেটাস দিতে পারা যাবে না। স্পেশ্যাল স্টেটাস রদ করতেও পারা যাবে না। হ্যাঁ, এমন অদ্ভুত প্রস্তাবও শোনা যাচ্ছে যে সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ করা হোক। কাশ্মীরকে করা হোক অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে একই গোত্রের। আমাদের প্রতিনিধিরা অতটা অদূরদর্শী হবেন না আশা করি। কাশ্মীর যে শর্তে ভারতে যোগ দিয়েছিল সে শর্তের অনেকখানিই ছাঁটকাট করা হয়েছে। অবশিষ্ট যা রয়েছে তাও যদি খারিজ হয় তবে সর্বনাশ।

হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্রে যদি মুসলিমপ্রধান রাজ্য থাকে তবে সে রাজ্য স্পেশ্যাল স্টেটাস চাইবেই। নইলে হিন্দুরা সেখানে অবাধে প্রবেশ করে উপনিবেশ স্থাপন করবে ও কালক্রমে সংখ্যাগুরু হবে। আসামে এ নিয়ে কম মনোমালিন্য নয়। আসামের সমস্যা ক্রমবর্ধমান বাঙালী সংখ্যা তথা মুসলিম সংখ্যা নিয়ে। সেখানেও স্পেশ্যাল স্টেটাসের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কাশ্মীর যদি ভারতে থাকে তবে এই ভরসায় থাকবে যে মুসলমানদের সংখ্যা ও সংখ্যানুপাত আগের মতোই থাকবে। তার হেরফের হবে না। সংবিধানে সেকথা অনুক্ত থাকলেও বিশেষ মর্যাদা বলতে সেই কথাই বোঝায়। কেন্দ্রে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য, হিন্দুর ভোটে কাশ্মীর তার বিশেষ মর্যাদা যে কোনোদিন হারাতে পারে, তার পর হিন্দুতে ভরে যেতে পারে। এই যে ডেমোক্রিসের খড়্গ কাশ্মীরী মুসলমানদের মাথার উপর ঝুলছে এর থেকে পরিত্রাণের জন্যে যদি কেউ পাকিস্তানে যোগ দিতে চায় বা স্বাধীন কাশ্মীর চায়,

সেটা ভারতবিরোধিতা নয়, হিন্দুপ্রাধান্য বিরোধিতা। আমাদের মূল সমস্যাই তো ভারত আর হিন্দুকে এক আর অভিন্ন ভাবা ও বলা। নেপাল হিন্দু রাষ্ট্র হতে পারে, ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হতে পারে না। অথচ এটাই হিন্দু রাষ্ট্রবাদীদের স্বপ্ন। তারাও তলে তলে সক্রিয়। যেখানেই সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল সেখানেই তাদের মতবাদ কাজ করছে। যেন এটা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান সকলের রাষ্ট্র নয়, কেবলমাত্র হিন্দুদের দেশ। হিন্দু নৃপতিরা যদি কখনো ভারত রাষ্ট্রের সিংহাসনে বসেন ভারত আবার ভেঙে চৌচির হবে। শিখেরা স্থাপন করবে শিখিস্থান বা খলিস্থান। খ্রীস্টানরা নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরার একাংশ মিলিয়ে খ্রীস্টানীস্থান। ধর্ম এখনো একটা প্রবল শক্তি। ভারতের স্বাধীনতার তথা সংহতির খাতিরে আমরা তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার থেকে আলাদা করে রেখেছি। এতদিন যে আমাদের স্বাধীনতা ও সংহতি অব্যাহত রয়েছে সেটা আমাদের সেকুলার নীতির জন্যেই। এ নীতি থেকে বিচ্যুত হতে গেলেই ভারতীয় সৈন্যদলে ভাঙন ধরবে। হিন্দু, শিখ, মুসলমান, খ্রীস্টান একসঙ্গে লড়বে না, এক সেনাপতির আদেশ মানবে না। বিশুদ্ধ হিন্দু সৈন্যদল কী চীনের সঙ্গে লড়তে পারবে? আক্রমণ রুখতে পারবে? গতবার যারা লড়েছিল তাদের সঙ্গে ছিলেন মানেকশা পারসী, এল পি সেন খ্রীস্টান। পাকিস্তানের সঙ্গে যতবার যুদ্ধ হয়েছে মুসলমান, খ্রীস্টান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, পারসী অফিসার ও জওয়ানরা বীরত্বের জন্যে পরমবীর চক্র, মহাবীর চক্র ইত্যাদি পেয়েছেন। একথা যদি আমরা ভুলে যাই চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেব।

কাশ্মীরে ও পাঞ্জাবে যা চলেছে তা একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা। যার অগ্নিপরীক্ষা তার নাম ভারতের সেকুলার নীতি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্মবর্জিত নয়, ধর্মের জন্যে মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি খোলা রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপার যেন হিন্দু বা মুসলিম বা খ্রীস্টান বা শিখ ধর্মীয় ব্যাপারের সঙ্গে একও অভিন্ন না হয়। যেটা পাকিস্তানে হয়েছে ও বাংলাদেশে হতে যাচ্ছে। আমরা এক অর্থে ব্রিটিশ শাসক-দের উত্তরাধিকারী, আরেক অর্থে গান্ধী-নেহরু নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী। ব্রিটিশ আমলকে কেউ খ্রীস্টান আমল বলে না, ওঁরা নিজেরাও বলতেন না। ওঁরা এদেশে ইংরেজ হিসাবেই এসেছিলেন, খ্রীস্টান হিসাবে নয়। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারকে ধর্মীয় ব্যাপারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন নি। আমরাও গুলিয়ে ফেলতে চাইনি। এইখানেই মোদের গরব, মোদের আশা।

তাছাড়া কাশ্মীরের সমস্যাটাই একটা সৃষ্টিছাড়া সমস্যা। তার একাংশ

ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়েছে, কিন্তু অপর অংশ এই ৩৭ বছর পরেও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশের মর্যাদা পায়নি। রাজ্য শব্দটার ওখানে ব্যবহার নেই। সেখানকার অধিবাসীরা এখনো পাকিস্তানী নাগরিক বলে গণ্য নয়। তাদের এলাকার নাম আজাদ কাশ্মীর। তারা আজাদ থাকতেই ভালোবাসে। কিন্তু কার্যত পাকিস্তানের অধীন। পাকিস্তানই যাঁকে খুশি তাঁকে সেখানকার শাসনকর্তার গদীতে বসায়। তাদের ভারতীয় কাশ্মীরে প্রবেশে মানা। অথচ সেখানেই রয়েছে তাদের ঐতিহাসিক রাজধানী, তাদের ঐতিহ্য, তাদের ভাষা ও সাহিত্য। এপারের কাশ্মীরীরাও কি ওপারে যেতে পারে? না, এদেরও যাওয়া বারণ। বার্লিনের দেয়ালেরও অনুমতি নিয়ে এপার থেকে ওপারে বা ওপার থেকে এপারে আসা-যাওয়া করা সম্ভব। কিন্তু কাশ্মীরের মাঝখানকার সীমান্ত রেখা লঙ্ঘন করেছো কি মরেছো। দু-দিকেই রণসজ্জা। এই বাধে কি ওই বাধে। সাঁইত্রিশ বছর পরেও এর নিষ্পত্তির লক্ষণ নেই। মানুষ মাত্রেরই আত্মীয় আছে। স্বজন আছে। তারা কি পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না? লুকিয়ে দেখা করলে সেটা কি একটা মহাপাপ বা মহাঅপরাধ হবে? কাশ্মীরীরা কিন্তু অন্যরকম ভাবে। বাংলাদেশ ভাগ হয়ে গেলেও মানুষ পাশপোর্ট ও ভিসা নিয়ে যাতায়াত করতে পারে। অনেকেই বিনা পাশপোর্ট ও বিনা ভিসায় চলাচল করে। পাঞ্জাব দু'ভাগ হয়ে গেলেও মানুষজন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি। সীমান্তের ওপার থেকে কমাণ্ডো এসে অমৃতসরে অকাল তখ্‌তে লড়াই করেছে। তাদের কেউ কেউ নাকি শিখই নয়। নকল দাড়ি ও পরচুলা পরে শিখ সাজে। অস্ত্রশস্ত্রের তো কথাই নেই। কাশ্মীরে তার তুলনায় কীইবা হয়েছে? অনর্থক 'বাঘ, বাঘ' বলে চেঁচালে কারো কারো রাজনৈতিক অভিসন্ধি সিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে বৃথা আতঙ্ক সঞ্চার করা হয়। কারো কারো মনে বৃথা আশা। তারা হয়তো বাঘকেই তাদের উদ্ধারকর্তা মনে করে।

ভারত যদি পাঞ্জাব হারায় তা হলে ভারত থেকে কাশ্মীর ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হবে। সেখানে ভারতীয় সেনানী থাকলে তারাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তখন যদি কতক লোক বিদ্রোহী হয় তবে সে বিদ্রোহ দমন করবে কে? ভারতের মূল সমস্যা এখন পাঞ্জাব। সেখানকার মুসলমানেরা নয়, শিখদেরই একাংশ এখন পাকিস্তানমুখো। বলা যেতে পারে ঘরমুখো। কারণ অনেকেরই ঘরবাড়ী ক্ষেতখামার গুরুদ্বারা সেখানে। আমি পার্টিশানের সময় থেকেই ভেবে এসেছি যে রথযাত্রার ত্রিশ বছর বাদে হবে উল্টো রথ। যারা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছে

তারা পূর্বপুরুষের ভিটার টানে যে যার জায়গায় ফিরে যেতে চাইবে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের মিটমাট হয়ে থাকবে। পাকিস্তান বাধা দেবে না। পলাতক মুসলমানরাও এপারে অবাধে প্রত্যাবর্তন করবে।

দুঃখের বিষয়, ভারত-পাকিস্তানে মিটমাট তো হয়ইনি, পাকিস্তান নাকি পারমাণবিক হাতিয়ার বানাচ্ছে। তার দিক থেকেও বলবার আছে। ভারত যতই বলবান হচ্ছে পাকিস্তানের আশঙ্কা ততই বাড়ছে। কে জানে ভারত হয়তো গায়ের জোরে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়ে পার্টিশনকে একদিন রদ করবে। অখণ্ড ভারত এখনো অনেকের স্বপ্ন। তারা সেটা গোপনও রাখে না, প্রকাশ্যে শোনায়। একথাও বলে যে সেটা হবে হিন্দু রাষ্ট্র। হিন্দু বলতে নাকি মুসলমানও বোঝায়।

১৯৮৫

অসম চুক্তি

অসমীয়াদের মতে তাঁদের রাজ্যের নাম অসম। আসাম নয়। বহুপ্রচলিত আসাম নামটির পরিবর্তে আমি অসমীয়াদের দ্বারা ব্যবহৃত অসম নামটিই ব্যবহার করছি। অসম শব্দটির অভিধানসম্মত অর্থ অসমান বা অসমতল। আমি এখানে যে চুক্তিটির কথা আলোচনা করতে যাচ্ছি সে চুক্তিটিও দুই অসমান পক্ষের দ্বারা সম্পাদিত। একপক্ষ ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী। অপরপক্ষ অখিল অসম ছাত্র সম্মেলন ও গণসংগ্রাম পরিষদ।

কথা উঠেছে এরকম অসম চুক্তির সম্পাদনা কি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ঠিক হয়েছে? এই ধরনের তর্কই উঠেছিল গান্ধী-আরউইন চুক্তির সময়। আরউইন হলেন রাজপ্রতিনিধি, তৎকালীন ভারত সাম্রাজ্যের বড়লাট। আর গান্ধীজী অবিসংবাদিত প্রজাপ্রতিনিধি নন। কংগ্রেস নামক একটি দলের প্রধান নেতা। কংগ্রেস ভিন্ন অন্য কয়েকটি দলও ছিল। সেসব দলের নেতারা মর্মাহত হন। গান্ধীজী আশা করেছিলেন যে আবার বড়লাটের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হবে ও সেই চুক্তি অনুসারে ক্ষমতার হস্তান্তর হবে। সে আশা পূর্ণ হয় না। জিন্না পরিচালিত মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবী তোলে। চুক্তি করলে জিন্নার সঙ্গেও চুক্তি করতে হতো।

অসম চুক্তি অসমান হলেও বে-নজীর নয়। সুতরাং প্রারম্ভিক আপত্তিটা খণ্ডন করতে পারি। এখন বিষয়বস্তুতে আসা যাক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর একটি চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুসারে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থী বা অনুপ্রবেশ-

কারীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর অধিকার ভারতের আছে। ইতিমধ্যে কতক লোককে ফেরত পাঠানো হয়েছে বা সে রকম আদেশ হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার অবশ্য ধুয়া ধরেছেন যে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর বাংলাদেশ থেকে কেউ ভারতে আশ্রয় নেয়নি বা অনুপ্রবেশ করেনি। এ নিয়ে সরকারে সরকারে তথ্য বিনিময় চলতে পারে। আমরা না জেনে না বুঝে তর্ক করতে যাই কেন? শোনা যাচ্ছে যে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর যারা এসেছে তাদের সংখ্যা এক লাখেরও কম। তা যদি হয়ে থাকে তবে বাংলাদেশ তাঁদের ফেরত না নিলে ভারত সরকার তাঁদের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে দিতে পারেন। বলা বাহুল্য তাঁদের ঘরবাড়ী ও জায়গাজমির জন্যে তাঁদের কিছু খেসারৎ দিতে হবে। সেটা হাতে পেলে তাঁরা সরকারী সাহায্যপ্রার্থী হবেন না। নিজেরাই করে কর্মে খাবেন।

আসল সমস্যাটা ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭১ মার্চ পর্যন্ত পাঁচ বছরের মধ্যে আগত হিন্দু শরণার্থী ও মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। অসমীয়া আন্দোলনকারীরা এঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন। সেটা সম্ভব না হলে এঁদের ভারতের অন্যান্য রাজ্যে চালান দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। সেটাও যদি সম্ভব না হয় তবে ভোটার তালিকা থেকে এঁদের নাম কেটে দিয়ে এঁদের ভারতীয় নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রস্তাবও করেছিলেন। ভারত সরকার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব খারিজ করে তৃতীয় প্রস্তাবই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বরাবরের মতো নয়, দশ বছরের মতো। ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম কাটা গেলেও তাঁরা যথাস্থানেই থাকবেন ও আর সব সুবিধা ভোগ করবেন।

পার্লামেন্টের আইনের সাহায্য না নিয়ে, প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধন না করে, যাঁরা বহুবার ভোট দিয়েছেন তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে শুধুমাত্র একটা সরকারী হুকুমনামার বলে বাদ দেওয়া যায় কি? আমার বিবেচনায়, যায় না। তা যদি হয় তবে এঁদের ভোটের জোরে যেসব আইনসভা গঠিত হয়েছে, সেইসব আইনসভার ভোটে যেসব সরকার গঠিত হয়েছে, আর সেইসব সরকারের দ্বারা যেসব অর্থব্যয় হয়েছে সমস্তই অবৈধ হয়ে যায়। পৃথিবীর আর কোথাও এমন দৃশ্য দেখা যায়নি যে পাইকারী হারে লক্ষ লক্ষ পুরাতন ভোটারের নাম কলমের এক খোঁচায় কেটে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তাঁরা তাঁদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে অক্ষম। তেমন কোনো সার্টিফিকেট তাঁদের কাছে নেই।

কিন্তু যদি কেউ তিন-চারবার ভোট দিয়ে থাকেন তবে কি ধরে নিতে পারা যায় না যে তাঁর নাগরিকত্ব অলিখিতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল ? সেই যে presumption সেটা কি তাঁর অনুকূলে যায় না ? তা যদি হয় তবে সরকারকেই rebutting evidence দাখিল করতে হবে। লক্ষ লক্ষ মামলায় লড়তে হবে সরকারকে। নিচের আদালতে, মাঝখানের আদালতে, উপরের আদালতে।

তবে এরও একটা কাটান আছে। সরকার ইচ্ছা করলে পার্লামেণ্টে আইন পাশ করিয়ে ভোটারের উপরেই প্রমাণের দায় চাপাতে পারেন। তখন ভোটারই মামলায় হেরে যাবে। এরকম একটা আইন পাশ করার আগে বোধহয় সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে। সরকার ইচ্ছা করলে সব পারেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হাইকোর্টে হেরেও পার্লামেণ্টের আইন বদবদল করে তাঁর আসন রক্ষা করেন। নির্বাচনী মামলা কেঁচে যায়।

তা হলে কী উপায় ? তা হলে ভোটার তালিকায় নাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়। আর সব অধিকার থাকবে, অথচ ভোটদানের অধিকার থাকবে না, এমন মানুষ কি ইণ্ডিয়ান সিটিজেন না রেসিডেণ্ট এলিয়েন ? শুনছি আমেরিকায় এরকম রেসিডেণ্ট এলিয়েন আছেন। তা যদি হয়ে থাকে তবে ভারত সরকার যা করেছেন তা নজীরবিহীন নয়।

এবার একটু অসমীয়াদের দিক থেকে বিচার করা যাক। ওঁদের কেসটা হচ্ছে, জবাহরলালজীর প্রতিশ্রুতির বলে পাকিস্তান থেকে যদি লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী দফায় দফায় আসতে থাকেন ও সেই প্রতিশ্রুতি বিশ ত্রিশ চল্লিশ বছর পরেও বলবৎ থাকে তা হলে অসমীয়ারা নিজ বাসভূমে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবেন। ত্রিপুরায় যেমন সেখানকার জনজাতিরা হয়েছেন। জবাহরলালজীর প্রতিশ্রুতির এরূপ ব্যাখ্যা করলে অসমীয়ারা ভারতরাষ্ট্র ত্যাগ করে স্বতন্ত্ররাষ্ট্র পত্তন করবেন। সংখ্যাগুরুত্ব তাঁদের চোখে এতই মূল্যবান যে ভারতীয় নাগরিকত্ব তার সমমূল্য নয়। এটা হলো সেণ্টিমেণ্টের ব্যাপার। এরকম সেণ্টিমেণ্ট কি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর নেই ? কেউ সংখ্যালঘু হতে রাজী পশ্চিমবঙ্গে ?

অসমীয়াদের এই সেণ্টিমেণ্টটিকে সসম্মানে মেনে নিলে সমস্যা অনেক সোজা হয়ে যায়। তাঁদের বিরূপভাব কেবল হিন্দু শরণার্থীদের প্রতি নয়, মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিও। একদা এঁদেরকে স্বাগত করা হয়েছিল এঁদের মুখে অসমীয়া বুলি ধরিয়ে দিয়ে এঁদের ন' অসমীয়া বা নয়া অসমীয়া বলে ভাষা

গোষ্ঠীভুক্ত করে বঙ্গভাষীদের উপর টেক্কা দিতে। বাংলাদেশের মুক্তির পর এঁরা অসমীয়া ছেড়ে বাংলা ধরেন। তার ফলে অপ্রিয় হন।

অসমীয়াদের গ্যারাণ্টি দিতে হবে যে তাঁদের রাজ্যে তাঁদের ভাষার লোকজন চিরকাল সংখ্যাগুরু থাকবেন। বাংলাদেশ থেকে বিদেশীরা দলে দলে গিয়ে তাঁদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করবেন না। যাঁরা বিদেশী নন, ভারতীয় নাগরিক তাঁরাও যদি দলে দলে যান ও কালক্রমে সংখ্যাগুরু হন তাতেও অসমীয়াদের আপত্তি। একথা ঠিক যে ভারতীয় নাগরিকমাত্রেরই ভারতের যে-কোনো প্রান্তে গিয়ে বসবাসের অধিকার আছে। কিন্তু তার মানে কি এই যে একসঙ্গে এক লাখ লোক গিয়ে জায়গা জমি কিনে উপনিবেশ স্থাপন করবেন? ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের যে অধিকার সমষ্টিগত ভাবে সে অধিকার খাটাতে গেলেই অনর্থ বেধে যাবে। ব্রিটিশ অপসারণের দিন সঙ্কট মুহূর্তে যা সহনীয় ছিল স্বাভাবিক সময়ে তা সহনীয় নয়। হিন্দু শরণার্থীরা যে কেবল আসামেই যাবে এমন কোনো অঙ্গীকার জবাহরলালজী করেননি। তারা যেখানে বাধা পাবে সেখানে না গিয়ে যেখানে বাধা পাবে না সেখানে যাবে। পাঞ্জাবী হিন্দু-শিখ সারা ভারতময় ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে স্বজন নেই বা স্বভাষী নেই সেখানে যাবে না, এমন কোনো অনীহা তাদের মধ্যে ছিল না। সিন্ধীরা বিশ্বের সর্বত্র ঠাঁই করে নেয়। সর্বত্র ধনবান হয়।

এত রাজ্য থাকতে বিশেষ করে অসমকে বেছে নেওয়া ও জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয় না। পার্টিশনের উপর পূর্ববঙ্গের হিন্দুর হাত ছিল না। সুতরাং সারা ভারত তাদের আশ্রয় দিতে বাধ্য। কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরা নয়। সমস্যার গোড়ায় এই ভুল বোঝাবুঝি। তখনকার দিনের গোটা অসম রাজ্যের উপর অসমীয়াদের অগ্রাধিকার না থাক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উপর নিশ্চয়ই অগ্রাধিকার ছিল। তারা হাজার বছর ধরে সেখানে বাস করে এসেছে। সেই অগ্রাধিকারটাকে চ্যালেঞ্জ করলে তারা ক্ষেপে যাবেই। ভারতীয় হিসাবে সকলের সম অধিকার হলো আইনের অনুশাসন। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে এই কথা বলে যে যারা আগে থেকে রয়েছে তাদের সম্মতি না নিয়ে পরে যারা এসেছে তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। এটা শুধু অসমে নয়, সর্বত্র সত্য। নেপালীরা এখন দার্জিলিঙে, সিকিমে, অসমের কয়েকটি জেলায় গিয়ে স্থান করে নিয়েছে। সিকিমে তাদের দলটাই ভারী। দার্জিলিংয়ের তিনটি মহকুমাতেও তাই। অসমের কোনো কোনো স্থলে। তাদের নিয়েও সমস্যা

বাধবে, যদি সময় থাকতে সাবধান না হওয়া যায়। বিদেশী বলতে অসমীয়ারা তাদেরও বোঝে। বহিরাগত বলতে তাদেরও বোঝায়।

ইংরেজীতে এরূপ সমস্যাকে বলা হয় ডেমোগ্রাফিক প্রবলেম। ডেমোক্রাসীর সঙ্গে যদি ডেমোগ্রাফির সংঘাত বাধে তবে ডেমোক্রাসীও টেকে কি না সন্দেহ। ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আইন সভার তথা সরকারের বাইরে রাখলে ডেমোক্রাসীর মর্যাদা থাকে না। আর সবাই শাসক হবে, তারা হবে শাসিত। যারা আপনাদের প্রতিবেশী তাদের সঙ্গে আপনাদের শাসক শাসিত সম্পর্ক নয়। তাই অসমীয়া বন্ধুদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন স্বেচ্ছায় এই বাছবিচার ত্যাগ করেন। আর বাঙালী বন্ধুদের প্রতি অনুরোধ তাঁরা যেন অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতিকে স্বেচ্ছায় আপন করে নেন। তার মানে এ নয় যে তাঁরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিসর্জন দেবেন।

সতেরো বছর আগে অসম সাহিত্য সভার আমন্ত্রণে আমি অসম ভ্রমণে যাই। অসমীয়া ভদ্রলোকদের বাড়ীতে অতিথি হই। বাংলা বোঝেন সকলেই, বলতেও পারেন অনেকেই। আমি জানতুম যে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিলে অসমীয়ারা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হবেন, তাই আমি ইংরেজীতেই ভাষণ দিতে শুরু করি। তখন সভা থেকেই রব ওঠে, "আপনি বাংলাতেই বলুন।" আমি বাংলাতেই বলি, শুধু ওই একটি জায়গায় নয়, প্রত্যেকটি জায়গায়। দোভাষীর প্রয়োজন হয় না। বাংলা ভাষার উপর মর্মগত বিরাগ আমি কোথাও লক্ষ করিনি। তবে এটাও নজরে পড়ে যে আমার ভাষণ শুনতে বাঙালীরা বড়ো একটা আসেন না। আমি অসমীয়াদের অতিথি হয়েছি বলে বাঙালীরা কেউ আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করেননি। ফিরে আসার মুখে একটা বক্তৃতার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলুম, বাঙালী ছাত্রদের সাহিত্য সভায়।' সময় ছিল না, যেতে পারিনি। গেলে হয়তো দেখতুম অসমীয়ারা আসেননি।

আরো আগে দিলীপকুমার রায়ও এটা লক্ষ করেছিলেন যে অসমীয়াদের অতিথি হলে বাঙালীরা অভিমান করেন ও বাঙালীদের অতিথি হলে অসমীয়ারা। তিনি বেশ বিব্রত বোধ করেন। আমরা সাহিত্যিকরা মিলনপিয়াসী। মিলতে পারলে প্রীত হই। কিন্তু দুই ভাষাগোষ্ঠীর বিবাদ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বাঙালীতে অসমীয়াতে সামাজিকতা পর্যন্ত বিরল। আশা করি এইবার দুই পক্ষের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বরফ গলতে শুরু করবে। কিন্তু জোর করে বলতে পারিনে। অসম চুক্তির পর আন্দোলনের নায়করা বলেন যে অসমীয়া সংস্কৃতির

একচ্ছত্রতা সবাইকে মেনে নিতে হবে। এটার তাৎপর্য যদি এই হয় যে সবাইকে অসমীয়া ভাষা শিক্ষা কর.ত হবে তা হলে তাতে কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়। অপর পক্ষে এর অর্থ যদি এই রকম যে কোথাও বাংলা পড়ানো হবে না, বাংলায় পড়ানো হবে না, কাছাড়েও বাংলা ভাষায় সরকারী কাজকর্ম করতে দেওয়া হবে না তা হলে সেটা আবার এক অনর্থের হেতু হবে। সংবিধানে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কাছাড়ের জেলা স্তরে বাংলার প্রচলন আইনসঙ্গত করে তখনকার ঝগড়া মিটিয়েছিলেন। ভারত সরকার এখন সে ব্যবস্থা রদবদল করতে পারেন না।

কাছাড় বাংলাভাষী থাকবেই। জোর করে কেউ তাকে অসমীয়াভাষী করতে পারবে না। কাছাড়ের বাইরেও বাঙালীর ছেলেমেয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের স্বাভাবিক অধিকার থেকে কেউ তাদের বঞ্চিত করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্টসংখ্যক অসমীয়া থাকলে তাদের অনুরূপ অধিকারও সুরক্ষিত হবে। পশ্চিমবঙ্গে অসমীয়া ভাষা নেই, সুতরাং অসমে বাংলা ভাষা থাকবে না এটা কুযুক্তি। তবে এটাও মনে রাখতে হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অসমীয়া অধ্যয়নের যে ব্যবস্থা করেছিলেন সে ব্যবস্থা আর নেই। সে ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা উচিত। স্যার আশুতোষকে অসমীয়ারা বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। আর আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কেও। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথকে না। তিনি একদা লিখেছিলেন যে অসমীয়া ভাষা বাংলার উপভাষা। সেই কথাটাই লোকে মনে রেখেছে, জানে না যে তিনি অসমীয়া মাইনরিটির বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্যে একবার 'ওয়েলফেয়ার' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ছাত্র বয়সে পড়েছি।

অসম ভ্রমণের সময় একজন আমার হাতে এক তাড়া পত্রিকা দেন। পড়ে দেখি ভগগিরি রায়চৌধুরী দাবী করেছেন যে বাঙালীদের শুধু অসমীয়া শিখলে হবে না, বাড়ীতেও অসমীয়া ভাষায় কথা বলতে হবে। চমৎকার!

এর পরে একদিন শুনতে পাব হয়তো এর চেয়েও উদ্ভট দাবী। অসমে থাকতে হলে সবাইকে অসমীয়া ভাষায় চিন্তা করতে হবে, স্বপ্ন দেখতে হবে। নইলে অসম রাজ্যের 'থট পুলিশ' বা 'ড্রীম পুলিশ' এসে ধরে নিয়ে যাবে ও মারতে মারতে চিন্তা ও স্বপ্ন ভুলিয়ে দেবে। অরওয়েলের '১৯৮৪' বইখানির মতো কেউ একজন '২০১৫' বলে একখানি বই লিখবেন। ততদিন যাঁরা বেঁচে থাকবেন তাঁরা দেখবেন ত্রিশ বছর পরে অসমবাসীরা সকলেই চিন্তায়, বাক্যে ও স্বপ্নে

শতকরা একশো ভাগ অসমীয়া। শুধু বাংলা নয়, 'বড়ো' প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষাও মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে গিয়ে থাকবে।

আমরা আমাদের অসমীয়া ভাইবোনদের অসমে সংখ্যাগুরুত্ব রক্ষার গ্যারান্টি দিতে পারি। তার বেশী দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার চেয়ে বেশী দাবী করলে অসম আবার বিভক্ত হবে। গোয়ালপাড়া ও কাছাড় অসম থেকে বেরিয়ে যাবে। এ দুটি জেলা ব্রিটিশ আমলেই অসমে সংযুক্ত হয়েছিল। এদের উপর অসমীয়াদের ঐতিহাসিক স্বত্ব নেই। বলা বাহুল্য এর ফলে অসম আরো সংকীর্ণ হবে ও তার সমৃদ্ধি আরো সীমাবদ্ধ হবে। বাঙালীদের উপস্থিতি যাঁদের চোখে অসহ্য তাঁদের জয় হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তেমন জয় কি কারো কাম্য? মেজরিটির অধিকার যেমন মান্য করা উচিত মাইনরিটির অধিকারও তেমনি মান্য করতে হয়। ভারতের সর্বত্র মাইনরিটি আছে ও তাদের সমান অধিকার আছে। অসম কি এক সৃষ্টিছাড়া রাজ্য!

অতীতে আসাম নামধেয় প্রদেশটি বৃহদায়তন ছিল। সে সময় বাঙালীদের সংখ্যাধিক্য ছিল। চাকরিবাকরিতেও বাড়বাড়ন্ত ছিল। এখন ক্ষুদ্রায়তন অসমে বাঙালীদের সংখ্যাধিক্য নেই। চাকরিবাকরিতেও বাড়বাড়ন্ত নেই। তা বলে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নয়। হবেও না। তারাও প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ নাম কাটলেও লক্ষ লক্ষ নাম বহাল থাকবে। অবশিষ্টদের ভোটও রাজনীতিক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান বিবেচিত হবে। অসমীয়া রাজনীতিকরাও তাঁদের দুয়ারে ভোট প্রার্থী হবেন। নাম কাটা ভোটাররাও দশ বছর বাদে ভোটদানের অধিকারী হবেন। দশ বছর ধরে তাঁদের রাজনীতি বহির্ভূত করে কার কী লাভ? কিছু লাভ যদি হয়ও তবু মাত্র দশ বছরের জন্যে। দশটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ইতিমধ্যে অসমীয়া বাঙালী সম্পর্ককে তিক্ততাশূন্য করতে হবে। তিক্ততা বজায় রেখে বা বাড়িয়ে বাঙালীদেরও বিশেষ কোনো লাভ হবে না। রাজীব গান্ধী কারো হুমকির কাছে নত হবেন না। পার্লামেন্টও তাঁকে নত হতে দেবে না। ভারতের জনমতও তাঁর পক্ষে। পাল্টা আন্দোলন করে অসমীয়াদের উপর শোধ তোলা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। প্রতিবাদ করতে চাও, করো। কিন্তু তাই করেই ক্ষান্ত হও।

অনেকের মতে অসমের আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছিল। সুতরাং অসম চুক্তির কোন আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু আবার যখন নির্বাচন হতো

আবার তুলকালাম কাণ্ড বাধত। তার কাটান এই চুক্তি। অনেকগুলি প্রাণ এর দ্বারা বাঁচল। সুতরাং এই চুক্তির সার্থকতা আছে। তা ছাড়া এ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে আসন্ন নির্বাচনের উপর দৃষ্টি রেখে। রাজীব গান্ধীর দল যদি নির্বাচনে জয়ী হয়ে অসমের হাল ধরেন তবে সংখ্যালঘুরাও আশা করতে পারবেন যে নতুন সরকার তাঁদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। যাঁরা ১৯৬৬ সালের পূর্বে এসেছেন তাঁরা সমান অধিকার নিয়ে নিরাপদে বাস করতে পারবেন। এতদিন তো তাঁরাও আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলেন।

১৯৮৫

(এই প্রবন্ধ নির্বাচনের পূর্বে লিখিত। নির্বাচনে জিতে অসম গণ পরিষদ্ সরকার গঠন করেছে। অভিনন্দন।)

ইন্দিরানামা

ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীর মতো ভাগ্যবতী কে? আর কার বাবা কারাকক্ষে বন্দী থেকে মেয়েকে নিয়মিত চিঠি লিখে সেই সূত্রে দেশ বিদেশের ইতিহাস শেখান? সঙ্গে সঙ্গে সরল সহজ সরস ইংরেজীও। ইন্দিরা যখন আরো বড়ো হন তখন আর একটু ভারী চিঠি পান। বিশ্ব ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। চিঠির ভাষা তত সরস নয়, তবু সুখপাঠ্য।

বেশ বোঝা যায় ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীকে জবাহরলাল আর পাঁচজন মেয়ের মতো করে মানুষ করেননি। তাঁর অভিপ্রায় ছিল তাঁকে বৃহত্তর দায়িত্বের জন্যে প্রস্তুত করা। যাতে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে চক্ষুষ্মানরূপে যোগ দেন। ইতিহাসের মঞ্চে সার্থক অভিনয় করেন। প্রধানমন্ত্রী হবার কল্পনা তাঁর নিজেরও ছিল না, তাঁর কন্যার তো ছিলই না। তখন স্বাধীনতার জন্যে জীবনপণ করার দিন। কে বাঁচবে, কে মরবে তার স্থিরতা নেই। ইন্দিরার জননী কমলা তো সংগ্রামের মাঝখানেই লোকান্তরিত হলেন।

জবাহরলাল তাঁর কন্যাকে সরকারী বিদ্যালয়ে পাঠাতে চাননি। প্রথাগত শিক্ষায় তাঁর আস্থা ছিল না। বিশ্বভারতীর ইংরেজীর অধ্যাপক জাহাঙ্গীর বকীল (Vakil) ও তাঁর স্ত্রী যখন বোম্বাই ফিরে গিয়ে নিজেরাই একটি নতুন ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন ইন্দিরাকেও সেখানে পাঠানো হয়। যাতে তিনি গুরুকুলবাসিনী ছাত্রী হয়ে নতুন ধরনে শিক্ষালাভ করেন। সংক্রামক রোগের ভয়ে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয় পুণায়। ইন্দিরাও সেখানে যান।

স্কুল শিক্ষার পর কলেজের শিক্ষা। এর জন্যে কন্যাকে ভর্তি করে দেওয়া হয় বিশ্বভারতীতে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল তার তত্ত্বাবধান করেন। সেখানেও তিনি আবাসিক ছাত্রী। পাঠ্য বিষয় ছাড়া সঙ্গীতে, নাটকে ও চিত্রকলায়

তাঁর আগ্রহ। শান্তিনিকেতনের আশ্রম জীবনে অনায়াসে খাপ' খাইয়ে তিনি তো বেশ আনন্দেই ছিলেন, থাকতেনও আরো কয়েক বছর। কিন্তু হঠাৎ তাঁর ডাক পড়ে তাঁর অসুস্থ মায়ের পাশে। মাকে নিয়ে যেতে হয় চিকিৎসার জন্যে বিদেশে। বাঁচেন না।

ইংলণ্ডে ও সুইটজারল্যাণ্ডে বছর চারেক পড়াশুনা করে ইন্দিরা ফেরেন। ইতিমধ্যে বাল্যবন্ধু ফিরোজ গান্ধীকেই তিনি বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করেছেন। কথাও দিয়েছেন। ফিরোজ পারসী বলে তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। ভালোবাসা যেখানে সত্যিকার সেখানে সবার উপরে মানুষ সত্য। ইন্দিরা তাঁর জীবনসাথী নির্বাচনে ভুল করেন নি। তাঁর পিতার আপত্তি ছিল। কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে আপত্তি। মহাত্মা গান্ধীরও আপত্তি ছিল। ধর্মভেদ নিয়ে আপত্তি। কিন্তু ইন্দিরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাই জবাহরলালকেও নতি স্বীকার করতে হয়। মহাত্মা গান্ধীকেও। বিবাহের সময় ইন্দিরাকে দেখা যায় বেনারসীর বদলে খদ্দরের শাড়ী পরতে। তাও তাঁর পিতার হাতে কাটা সুতো দিয়ে বোনা। কোনো প্রকার আড়ম্বর ছিল না বিবাহ অনুষ্ঠানে। পারিবারিক বন্ধুবান্ধব যোগ দিয়েছিল। দেশসেবকরাও। তবে রক্ষণশীল পারসীরা ইন্দিরাকে গ্রহণ করেননি। অন্তর্বিবাহ তাঁদের মতবিরুদ্ধ। তেমনি, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণরাও অনেকদিন পর্যন্ত ইন্দিরাকে তাঁদের পারিবারিক কর্মে আমন্ত্রণ করলেও অন্দরে প্রবেশ করতে দিতেন না। বাইরেই আতিথিচর্যা করতেন। পরে অবশ্য বেড়া ভেঙে যায়। যে বেড়া কোনোদিনই ভাঙে না, শেষজীবনেও না, সেটা হলো পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বেড়া। যেহেতু পারসীকে বিয়ে করে ইন্দিরা নাকি পারসী। ভারতের আর সব হিন্দু মন্দিরে তিনি স্বাগত ছিলেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টির সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বৈদিক মন্ত্রপাঠ করেন। রাজীবই মুখাগ্নি করেন। কোনোখানেই প্রতিবাদের গুঞ্জন শোনা যায় না। ইন্দিরাকে ও তাঁর পুত্রদ্বয়কে হিন্দুসমাজ আপন করে নিয়ে আপনি উদারতর হয়েছে। পারসীরাও বলতে আরম্ভ করেছেন 'আমাদের রাজীব'। ভারতীয় আর্য ও ইরানী আর্যদের মধ্যে মেল চার হাজার বছর পরে এই প্রথমবার ঘটল। এটাও ইন্দিরার অন্যতম কীর্তি। রাজনৈতিক নয়, সামাজিক।

বিবাহের অল্পদিন পরেই 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনে ঝাঁপ দেন তিনি ও তাঁর স্বামী। বাল্যকাল থেকেই তিনি সপরিবারে স্বাধীনতা সংগ্রামী। মোতিলাল, স্বরূপরানী, জবাহরলাল, কমলা, বিজয়লক্ষ্মী, কৃষ্ণা যে পথের পথিক তিনিও সেই পথের। সে পথ কারাগারের পথ। বছরখানেক দণ্ডভোগের পর ইন্দিরা ও

ফিরোজ মুক্তি পান। এবার তাঁরা সংসারে মন দেন। যথাকালে রাজীব ও সঞ্জয়ের জন্ম হয়। আর দশজনের মতো ইন্দিরাও ব্যস্ত থাকেন তাঁর গৃহকর্মে। কিন্তু সদ্য স্বাধীন ভারতের রাজধানীর বুকের উপর যে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব চলে তাকে থামানোর জন্যে ও শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্যে নতুন সরকারের অনুরোধে মহাত্মা গান্ধীকে ও মহাত্মাজীর নির্দেশে ইন্দিরা গান্ধীকেও তৎপর হতে হয়। ভারত সেদিন যে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল তা বিশ্বের ইতিহাসে তুলনাহীন। পাঞ্জাবে নিহত হয়েছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ। প্রাণের ভয়ে সবকিছু ফেলে পালিয়ে এসেছিল প্রায় দু কোটিখানেক লোক। এইসব ছিন্নমূল নরনারী কোথায় থাকবে, কোন কাজে লাগবে, কেমন করে দুঃখ শোক ভুলবে, সে এক মহাসমস্যা। এর সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে ইন্দিরা তাঁর কর্মকুশলতা অর্জন করেন। নেতৃত্ব গ্রহণ করতেও শেখেন। ঘরের চেয়ে বাইরের কাজ বাড়ে। সেই বাইরের কাজের সিঁড়ি বেয়ে তিনি একটু একটু করে উপরে ওঠেন। রাজনীতি করে নয়। সমাজসেবা করে। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ তাঁর ছিল না। পিতার প্রধানমন্ত্রিত্বের সুযোগ তিনি চাননি। জবাহরলালও সেটা পছন্দ করতেন না।

প্রধানমন্ত্রী পদের একটা সামাজিক দিক আছে। দেশবিদেশের বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি তাঁর ভবনের কিংবা ভোজনের অতিথি হন। সাধারণত প্রধানমন্ত্রীদের সহধর্মিণীরাই অতিথিচর্চার ভার বহন করেন। এটাই আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বিপত্নীক। সুতরাং তাঁর কন্যাকেই এ দায় মাথায় তুলে নিতে হয়। এবং সেই কারণে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনই হয় তাঁর বাসভবন। এটা ফিরোজের পক্ষে সম্মানজনক ছিল না। এমনি করে এক অমীমাংস্য সমস্যার সূত্রপাত হয়। পরিণতি মর্মান্তিক। ফিরোজ যদি আরো কিছুদিন বাঁচতেন তাহলে জবাহরলালের মৃত্যুর পর স্বামী স্ত্রী ও সন্তানদ্বয় একসঙ্গে থাকতে পারতেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। ইন্দিরাকে পর পর দু দুটো গুরুতর আঘাত পোহাতে হয়। প্রথমে স্বামীর মৃত্যু, কিছুদিন পরে পিতার মৃত্যু।

কংগ্রেস সভাপতি হতে ইন্দিরা একটুও ইচ্ছুক ছিলেন না। সেই মুকুটটা তাঁর মাথায় পরিয়ে দেন ভীষ্মপ্রতিম নেতা গোবিন্দবল্লভ পন্ত। সেটাও একপ্রকার অভিষেক। গান্ধীজী তরুণ জবাহরের শিরেও কংগ্রেস সভাপতিপদের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। তখন কি কেউ জানত যে জবাহর একদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন? তেমনি তাঁর কন্যার কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচনের দিন কেউ জানত না যে তিনিও একদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। গান্ধীজী ও

পন্তজী দূরদর্শী ছিলেন। কার মধ্যে কিসের সম্ভাব্যতা আছে সেটা তারা অগ্রিম আঁচ করতে জানতেন। অবশ্য লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জীবিত থাকলে ইন্দিরা যে কালে প্রধানমন্ত্রী হন সে কালে হতে পারতেন না। কিন্তু কোনো কালেই হতেন না একথা কেমন করে বলব? পক্ষান্তরে এমনও হতে পারত যে কংগ্রেস তার জনপ্রিয়তা হারিয়ে বরাবরের মতো গদী হারাত। ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রিত্বের সুযোগ পেতেন না।

তথ্য এই যে, ইন্দিরা প্রথমে সাধারণ একজন মন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্ত্রী হয়ে দক্ষতার ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যেদিন প্রধানমন্ত্রী হন সেদিন ঘটনাচক্রে আমি দিল্লীতে উপস্থিত ছিলুম। তাঁর আগেই তাঁকে আমি কয়েকবার শান্তিনিকেতনে তাঁর পিতার সঙ্গে দেখেছি ও তাঁদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আহার করেছি। একবার হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর ভবনে যেতে হয়। উপলক্ষটা মনে নেই। তাঁর সেই লাজুক নম্র মুখে রাজনীতির লেশ ছিল না। সুতরাং তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পদে বরণ একটা চমকপ্রদ ঘটনা। আমার সঙ্গে যেসব বুদ্ধিজীবী এক সেমিনারে মিলিত হয়েছিলেন তাঁদের একজন আমাকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করেন এ কী রকম হলো? ইনি কি ও পদের যোগ্য। আমিও সহাস্যে উত্তর দিই, ইনি আমাদের রানী এলিজাবেথ। তখন আমি নারীর প্রতি শিভালরি প্রকাশ করেছি। যোগ্যতা সম্বন্ধে আমারও সংশয় ছিল। সে সংশয় দিনে দিনে দূর হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বোঝা যায় ইন্দিরা ভিন্ন আর কারো অত সাহস হতো না যে নিকসন ও মাওকে তুচ্ছ করে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য প্রেরণ করতেন ও পাকিস্তানী ফৌজকে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করতেন। ইন্দিরা ভিন্ন আর কারো এত বুদ্ধি ছিল না যে অভিযানের পূর্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করে চীনের হস্তক্ষেপের পথ রুদ্ধ করতেন। সবাইকে স্বীকার করতে হয় যে প্রধানমন্ত্রী পদের উপযুক্ত পাত্রী বটে। কেউ কেউ তো বলেন তিনি তাঁর পিতাকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

এর পরে ইন্দিরার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা বহুবার শুনেছি তাঁর সমালোচকদের মুখেও। চাতুরীতে তাঁকে হারিয়ে দেওয়া কারো পক্ষে সহজ ছিল না। এখন যেটা তার চেয়েও বড়ো কথা তিনি জানতেন অন্যান্য শক্তিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেমন করে ভারতের স্বাধীনতার সারবস্তু রক্ষা করতে হয়। ভারতের স্বাধীনতা তাঁর প্রহরায় নিরাপদ ছিল। স্বাধীনতা লাভ করা যত না কঠিন তাকে রক্ষা করা তার চেয়েও কঠিন। বিশেষত ভারতের মতো দেশের পক্ষে।

যার পররাষ্ট্রনীতি পূবদিকেও হেলে না, পশ্চিমদিকেও হেলে না। বিদেশী সৈন্যদের ঘাঁটি দেয় না। বিদেশে সৈন্য পাঠায় না। দুশো বছর পরে সত্যিই বিদেশী সেনামুক্ত।

দেশের স্বাধীনতা আর জাতির একতা অবিচ্ছেদ্য। জাতি যদি ভিতরে ভিতরে ভেঙে যায় তবে দেশের স্বাধীনতাও বিপন্ন হয়। ভারতের ইতিহাসে এর বিস্তর নজীর। ভাঙনের প্রবণতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। গান্ধীজীকে, জবাহরলালজীকে, বল্লভভাইকে এই প্রবণতা বিভিন্নভাবে রোধ করতে হয়েছে। কিন্তু ইন্দিরার আমলেই দেখা গেল বেশ কয়েকটি প্রদেশ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বিমুখ। তাদের অভিপ্রায় সংবিধানের বহির্ভূত অধিকার লাভ ও তার জন্যে হিংসার পন্থা অনুসরণ। অপ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে উপায় ছিল না। তেমন সিদ্ধান্ত সময়মতো নিতে পারা যেত না. নিলে বিরূপ সমালোচনা শুনতে হতো। বিলম্বে সিদ্ধান্ত নিলে অনেক বেশী রাজক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। ইন্দিরাকে এর জন্যে দোষ দেওয়া বৃথা। তিনি না হয়ে আর কেউ হলেও একই ব্যাপার হত।

শিখ সমস্যার কোন সামরিক সমাধান নেই। রাজনৈতিক সমাধানই খুঁজে বার করতে হবে। সন্ত্রাসবাদীদের শেষ করে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। দশ বছরের মধ্যে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। শিখ সমস্যা যে কত পুরাতন ও কত জটিল সে ধারণা যাঁদের আছে তাঁরা অমৃতসরের ঘটনার পর মিষ্টান্ন বিতরণ করেননি। বরং ভাবনায় ও ভয়ে প্রতিশোধের অপেক্ষা করছিলেন। তা বলে প্রতিশোধ যে এমন অভাবনীয় রূপ নেবে তা কে জানত! স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই নিহত হবেন তাঁর বিশ্বস্ত দেহরক্ষীদের দু'জনের আঠারোটা গুলীতে! সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডী।

আবার মিষ্টান্ন বিতরণ। এবার হিন্দুদের দ্বারা নয়, শিখদের দ্বারা। হিন্দুরা উন্মাদের মতো আরো ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেয়। আপাতত হিংসা প্রতিহিংসা স্তব্ধ রয়েছে। এর থেকে যেন কেউ মনে না করেন কারো অন্তঃপরিবর্তন ঘটেছে। ও পথে অন্তঃপরিবর্তন আসবে না, আসতে পারবে না। ঘটনা-পরম্পরা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিখরা হিন্দুদের পর নয়। আক্ষরিক অর্থে একই রক্ত, একই মাংস। হিন্দু-শিখের বিবাহ হামেশা হয়। আমারই চেনাজানার মধ্যে হয়েছে। ইন্দিরার পরিবারেই এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইন্দিরার পতি যেমন পারসী, পুত্রবধূরা তেমনি ক্যাথলিক ও শিখ। অমন একটি

সেকুলার পরিবার আর নেই। নেহরু বংশের মেয়েরা মুসলমানও বিয়ে করেছেন। ইন্দিরার নিজের জীবনই সেকুলার ভারতের প্রতিরূপ। অমন একটি জীবন অকালে নির্বাপিত হলো এর তাৎপর্য অনুধাবন করলে সেকুলার রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও উদ্বিগ্ন হতে হয়।

দেশের সংহতি রক্ষার জন্যে ইন্দিরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়েছেন। দিতে তিনি কৃতসংকল্প ছিলেন। শুধু সংহতির জন্যে নয়, সেকুলার মূলনীতির জন্যেও। শিখদের এখন বোঝাতে হবে সেকুলার মূলনীতি হিন্দুদের স্বার্থে নয়। বরং তার বিপরীত। হিন্দুর স্বার্থই একমাত্র গণনা হলে ভারত হিন্দু রাষ্ট্রই হতো। যেমন পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হয়েছে। হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করা মোটেই কঠিন ছিল না। ভোটে হিন্দুদেরই ব্রুট মেজরিটি। যার ভয়ে মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবী করে ও পায়। হিন্দুরা হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও হিন্দু রাষ্ট্রের লোভ সংবরণ করে। স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেকুলার স্টেট পত্তন করে। যাতে ভারত রাষ্ট্রের মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, পারসী নাগরিকরা সমান মর্যাদার অধিকারী হন। এক হাতে যারা সেকুলার রাষ্ট্র গঠন করেছেন আরেক হাতে তাঁরা সেই রাষ্ট্রকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারেন না। সে কাজ করতে পারেন অন্য এক দল। সে দল ভারতের কোনখানেই সরকার গঠন করেনি। হিন্দু জনগণ তাকে ভোটে জিতিয়ে দেয়নি। হিন্দু রাষ্ট্রের দেখাদেখি শিখ রাষ্ট্র গঠন করার মতো প্রবর্তনা নেহরু, শাস্ত্রী বা ইন্দিরা কেউ জোগান নি। ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি সব গণতন্ত্রেই লক্ষ করা যায়। ভারত যদি ব্যতিক্রম হতো তা হলে অবশ্য খুবই ভালো হতো। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে ভুলচুক হয়েছে। এটা মেনে নিতে আমি কুণ্ঠিত নই।

মুসলমানরা যদি পাকিস্তান নিয়ে থাকে তবে শিখরা কেন শিখিস্থান বা খলিস্থান পাবে না? এই হলো শিখ উগ্রপন্থীদের যুক্তি। এর জন্যে তারা লড়তে ও মরতে প্রস্তুত। পাকিস্তান শুধু যে সম্ভব হয়েছে তাই নয়, অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, নানা দিক থেকে সাহায্য পেয়ে বলবান হয়েছে। শিখরা কিসে কম? এখন তো পুনর্গঠিত পাঞ্জাবে তাদেরই সংখ্যাধিক্য। যেটা সাতচল্লিশ সালে ছিল না। কেন তবে তারা পাকিস্তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বতন্ত্র স্থান পাবে না? তা সে যতই ক্ষুদ্র হোক। তারপরে হিন্দুরা ইচ্ছে করলে হিন্দুস্থানকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। কেউ বাধা দেবে না। কাশ্মীর হাতছাড়া হবে? হোক না। তাতে শিখদের

কী ক্ষতি? পাকিস্তানের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা আছে? কিন্তু সে বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে পশ্চিমী শক্তির সৌজন্যে। শিখদের তারা মিত্ররূপে পেতে চায়। শিখরাও তাতে রাজী। সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে তারা পশ্চিমীদের পক্ষে লড়বে। যে পক্ষে শিখ সে পক্ষে জয়।

পাকিস্তান যতদিন না ভারতের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে ততদিন বাইরের উস্কানি শিখদের মাতিয়ে রাখবে, তাতিয়ে রাখবে। খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে। খুঁটি যতদিন শক্ত থাকবে ততদিন এ সমস্যা মেটানো শক্ত হবে। তবু আন্তরিক চেষ্টা করা উচিত। যাঁরা করবেন তাঁরা যেন হিন্দুর স্বার্থের কথা মন থেকে মুছে ফেলেন। ভারতের স্বার্থই বড়ো। সে স্বার্থ হিন্দুর স্বার্থের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। কিন্তু এই ভুলটি বহুদিন থেকে করা চলেছে, এখনও চলছে। ভারত যদি বাঁচে হিন্দুও বাঁচবে। ভারত যদি মরে হিন্দুও মরবে। এই গণনা থেকেই ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করা হয়েছে। এতে হিন্দুর যদি ক্ষতি হয়ে থাকে তো পরম লাভ হাজার বছর পরে স্বাধীনতা লাভ। একে বিপন্ন করে এখানে কয়েকটা আসন, সেখানে কয়েকটা মন্ত্রিত্ব নিয়ে তারা করবেই বা কী, যদি আবার গৃহযুদ্ধ বাধে ও সেই ছিদ্র দিয়ে বিদেশীরা পুনঃপ্রবেশ করে? যাতে স্বাধীনতা অটুট থাকে সেটাই কর্তব্য। সংহতি তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। শিখরাও মুসলমানদের মতো স্বতন্ত্র একটি ধর্মসম্প্রদায়, কোনো অর্থেই হিন্দু নয়, হিন্দুধর্মের বা সমাজের শাখা নয়, এটা মেনে না নিলে এ সমস্যা কোনোকালেই মিটবে না। আর এটা সত্য হলে শিখদের হাতে এত হিন্দু মরত না, হিন্দুদের হাতেও আরো বেশী শিখ মরত না। অন্তত হিন্দুরা তাদের শিখ বংশধরদের মেরে তাড়িয়ে দিত না। ওরা সবাই গিয়ে পাঞ্জাবে জড়ো হলে সেখানকার হিন্দুদেরও তো বিপদ।

শিখরা হিন্দু সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বাঁচবে না! তাদের প্রকৃত বন্ধু পাকিস্তান নয়। পাকিস্তানের মিতারাও নন। বিদেশে গিয়ে বিদেশের তাঁবেদার হয়ে তাঁরা যে স্বাধীনতা পাবে তা পরাধীন স্বাধীনতা। তেমন স্বাধীনতার জন্যে ভগৎ সিং প্রাণ দেননি. গদর পার্টি সংগ্রাম করেনি। তাছাড়া শিখরা যদি খলিস্থান পায় সেটা কি কেবল ভারতের খরচেই হবে, পাকিস্তানের খরচে নয়? পাকিস্তানে কি শিখদের প্রাপ্য স্থান নেই? গুরু নানকের নানকানা সাহিব, মহারাজা রণজিৎ সিংহের লাহোর কোথায় অবস্থিত? সম্ভবত তার জন্যে পাকিস্তানের সঙ্গেও যুঝতে হবে। তখন সহায় হবে কে?

কোন্ পশ্চিমী শক্তি? শিখরা ভারত ছাড়লে পরে ভারতের কী স্বার্থ। চিরদিন কারো আসন শূন্য থাকে না। ভারতীয় সৈন্যদলেও শিখদের আসন শূন্য থাকবে না। দুর্বল হিন্দুও সবল হিন্দু হবে। তাছাড়া খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, পারসী তো থাকবেই। ভারতীয় ফৌজে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদেরও সুযোগ্য আসন। একবার ভারতে যোগ দেবার পর, ভারতীয় নাগরিক হবার পর, ভারতীয় সংবিধান স্বীকার করার পর সংহতি বিরোধী দাবী হাজির করা চলে না। শিখিস্থান বা খলিস্থানের দাবী মাউন্টব্যাটেনই খারিজ করে দিয়ে গেছেন। ইন্দিরা গান্ধী নতুন করে খারিজ করেননি। ব্রিটিশ মুরুব্বিরাই শিখদের ডুবিয়ে দিয়ে বিদায় নেন। কংগ্রেস নেতারাই বরং ডুবুরির কাজ করেন। তাদের খাইয়ে দাইয়ে আশ্রয় দিয়ে জীবিকা দিয়ে সম্পত্তির পরিবর্তে সম্পত্তি দিয়ে কোলে তুলে নেন।

মিটমাট একদিন না একদিন হবেই। সেদিন প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাকে আর আমরা ফিরে পাব না। সে ক্ষতি সত্যিই অপূরণীয়। জীবনের নানা দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। রাজনীতি, অর্থনীতির বাইরে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পকলায়, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তি বিদ্যায় রুচি ছিল। অবশ্য জবাহরলালের মতো পাণ্ডিত্য বা চিন্তাশীলতা তাঁর ছিল না। অপরপক্ষে জবাহরলালের চেয়ে ইন্দিরার ইচ্ছাশক্তি ছিল আরো প্রবল। মানুষ চিনতেও তিনি আরো ভালো পারতেন। একজনের সঙ্গে আরেকজনের তুলনা করা ঠিক নয়। প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়।

ইন্দিরাকে তাঁর দেশের লোক ভুলবে না। ভারতের ইতিহাসে অমন নারী আর হননি। একমাত্র রাজিয়াকেই দেখা গেছে সুলতানা হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসতে। তাঁরও পরিণাম ট্র্যাজিক। তাঁর রাজ্য এত দূর বিস্তৃত ছিল না। তা ছাড়া গণতন্ত্র পরিচালনা আরো কঠিন কাজ। আবার সেই তুলনা এসে পড়ল। প্রত্যেকেই অতুলনীয়। ইন্দিরা তাঁর ছাপ রেখে গেছেন। ভারতের বাইরে শতাধিক নেশন তাঁকে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের সভানেত্রী নির্বাচন করে তাঁর উপর আস্থা প্রকাশ করেন। ইন্দিরা যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথই স্বেচ্ছায় ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রহণ করেছেন। এতে ভারতেরও প্রেস্টিজ বেড়েছে। ভারতীয়রা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছেন। ভারতীয়দের মধ্যে আন্তর্জাতিক মনস্কতা প্রসারিত হয়েছে। তবে দারিদ্র্যমোচন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ভাবে হয়নি। পরিবার পরিকল্পনাও নয়। বহু দিক থেকে বহু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। ইন্দিরা জীবিত থাকলে সেসব দিকেও আরো নজর দিতেন। তাঁর জীবিত থাকার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু তিনি না থাকলেও তাঁর আত্মা আমাদের প্রেরণা দিতে থাকবে। বিশেষত তাঁর পুত্র রাজীবকে। ইন্দিরা গান্ধী অমর রহে।

১৯৮৫

যাহা নাই ভারতে

ইংলণ্ডের সংবিধান অলিখিত। সেদেশের সংবিধানের আড়ালে রয়েছে একাধিক কনভেনশন। কনভেনশন মান্য করে চলাই সেদেশের প্রথা। দুয়েকটা দৃষ্টান্ত দিই। পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সেখানে ভোটে হেরে না গেলে রক্ষণশীল দল গদী ছাড়তে বাধ্য নন। কিন্তু তাঁরা স্বেচ্ছায় গদী ছাড়তে পারেন, যদি দেখেন একটার পর একটা উপনির্বাচনে তাঁদের প্রার্থীর হার হচ্ছে। পার্লামেণ্টে তাঁদের সদস্য সংখ্যা কমে যাচ্ছে। যথাকালে অনাস্থা প্রস্তাব আসবে ও সে প্রস্তাব তাঁদের বিপক্ষেই পাশ হবে। সুতরাং মানে মানে গদীত্যাগই শ্রেয়। তাঁদের পরামর্শে রাজা নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এক মাসের মধ্যেই স্থির হয়ে যায় কোন দল ক্ষমতার আসনে বসবেন। এটাই খেলার নিয়ম।

দেশের সম্মুখে এমন এক পরিস্থিতির উদয় হতে পারে যখন রাজাকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উদ্যোগী হতে হয়। তিনি যদি মনে করেন রক্ষণশীল দলের গদীত্যাগই শ্রেয়, অথচ প্রধানমন্ত্রীর মত তার বিপরীত তা হলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও পুনঃ নির্বাচন শ্রেয় মনে করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর পরামর্শ অগ্রাহ্য করলে তিনি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন। পার্লামেণ্ট প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ নিলে রাজা পার্লামেণ্টকেও ভেঙে দিতে পারেন। কিন্তু নতুন নির্বাচনে যদি রক্ষণশীল দলের জয় হয় তা হলে রাজাকেই হতমান হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে। এত বড়ো একটা ঝুঁকি নিতে কোন রাজাই বা এগিয়ে আসবেন? তাই রাজা বসে থাকেন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে। আসলে তিনি ঠুঁটো নন। তাঁর হাত দুটি প্রজার নাড়ীর উপরে, পরিস্থিতির গুরুত্বের উপরে। প্রধানমন্ত্রী যদি হঠকারিতা করে যুদ্ধ বাধিয়ে বসেন,

আর যুদ্ধটা হয় প্রচণ্ড ক্ষতিকর, রাজা নিশ্চয় প্রধানমন্ত্রীকে তলব করে তাঁর ডিসপ্লেজার জানাবেন। ইংলণ্ডের সরকার রাজার প্লেজারানুসারেই চলে। আর রাজাও প্রজার প্লেজার বুঝে কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়মিতভাবে বার্কিংহাম প্যালেসে গিয়ে রাজদর্শন করতে হয়। জানাতে হয় দেশের হাল। সব সংবাদপত্রই রাজা বা তাঁর ব্যক্তিগত সচিব পড়েন। সব প্রজারই দৃষ্টি রাজার উপরে। তারা নিশ্চিত জানে তাদের রাজা তাদের বিশ্বস্ত রক্ষক। প্রধানমন্ত্রীর উপরে সেই পরিমাণ বিশ্বাস বহু লোকের নেই। সেটা দেখা গেল চেম্বারলেনের মিউনিক চুক্তির সময়। কিন্তু বিষয়টা বিতর্কিত বলে রাজা হস্তক্ষেপ করেননি।

এই দুটো দৃষ্টান্তের থেকে মালুম হবে কনভেনশনের জোর কতখানি। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের দায়িত্ব রক্ষণশীলরা একা বহন করতে ভয় পান। লেবারকে ডাকেন কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিতে। লেবার বলে চেম্বারলেন থাকতে নয়। চার্চিলকে চাই। চার্চিল যদিও লেবার দলের পুরাতন শত্রু তবু হিটলারের শত্রু তো বটে। কে জানে চেম্বারলেন হয়তো আবার একটা চুক্তি করবেন, তার চেয়ে চার্চিলের নেতৃত্ব ভালো। তিনি কখনো আপস করবেন না। তাঁর কথা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ। তিনি এক কথার মানুষ। হিটলারের আশঙ্কা ছিল যে চার্চিলই হয়তো প্রধানমন্ত্রী হবেন। অবিকল তাই হলো। ইংলণ্ডের নাৎসী দরদীরা ছিলেন কমিউনিস্টবিদ্বেষী। চার্চিল যদিও কমিউনিস্টবিদ্বেষীদের সর্দার তবু সেই তিনিই হিটলারকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্যে কমিউনিস্টদের সর্দারের সঙ্গে চুক্তি করেন। চেম্বারলেন ছুটেছিলেন মিউনিকে, চার্চিল ছুটে যান মস্কোতে। স্টালিন কিন্তু লণ্ডনে ছুটে আসেন না। যুদ্ধকালে পট পরিবর্তন প্রথম মহাযুদ্ধেও হয়েছিল। অ্যাসকুইথের জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হন লয়েড জর্জ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চেম্বারলেনের জায়গায় বসেন চার্চিল। সেবার লিবারল কনসারভেটিভ কোয়ালিশন। এবার কনসারভেটিভ লেবার কোয়ালিশন। এটাও একপ্রকার আপৎকালীন কনভেনশন।

আমাদের সংবিধান অলিখিত নয়, লিখিত। এটি একটি মহাভারত তুল্য মহাগ্রন্থ। এর তুলনায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান তো শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান তো আরো সংক্ষিপ্ত। আমাদের সংবিধান সব রকম সম্ভবপর পরিস্থিতির জন্যে নীতি নির্দেশ করে রেখেছে। যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে। কিন্তু এই মহাভারত নীতির বাইরে রীতি গড়ে ওঠার অবকাশ রাখেনি। তাই অনেক ব্যাপারেই ঘটছে যা নিয়ে গুরুতর মতভেদ। তার

'থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের বন্ধ। এই প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে তেমনি একটি বন্ধের দিন। এর তাৎপর্য, কেন্দ্রের উপর রাজ্যের আস্থা নেই। এমনি করে ট্র্যাজেডীর বীজ রোপণ করা হচ্ছে। যথাকালে এর থেকে গজাবে ও বাড়বে পাঞ্জাবের মতো ট্র্যাজেডী। ঈশ্বর না করুন।

উপলক্ষটা অহেতুক নয়। সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে এমন কোনো ক্ষমতা দেয়নি যে তাঁদের নির্দেশে তাঁদের দ্বারা নিযুক্ত রাজ্যপাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অপসারণ ও নতুন মুখ্যমন্ত্রীর অভিষেক করবেন। রাজ্যের অরাজক অবস্থা হলে অবশ্য মন্ত্রীদের বরখাস্ত করে গভর্নর স্বহস্তে শাসনভার নিতে পারেন। এর বিধান সংবিধানেই রয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন নেই, এটা রাজ্যপাল রাজভবনে বসে জানবেন কী করে? সে রকম সংবাদ যদি তাঁর কানে পৌঁছয় তাঁর কর্তব্য হবে বিধানসভা অধিবেশন ডেকে নির্বাচিত সদস্যদের ভোট নেওয়া। সেটা অবিলম্বে করা উচিত। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে অধিকাংশ ভোট না থাকলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা করবেন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ। তিনি নারাজ হলে রাজ্যপাল তাঁকে বরখাস্ত করতে পারবেন। দুই পক্ষে সমান ভোট পড়লে, রাজ্যের অবস্থা উদ্বেল হলে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন ঘটাতে পারবেন। কিন্তু পর পর তিনটি রাজ্যের তিনজন রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীদের বরখাস্ত করে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর উপর রাজ্যের শাসনভার সঁপে দিয়ে যা করেছেন তা বিধানসভার অধিবেশনের জন্যে অপেক্ষা না করেই। ইতিমধ্যে ঘোড়া বেচাকেনার প্রশস্ত অবসর। কালো টাকাও মজুত।

একই দৃশ্য বার বার তিনবার দেখে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত সরকারের যদি আশঙ্কা হয়ে থাকে যে এর পরে আসছে তাঁদের পালা তবে সেটা কি অযৌক্তিক? সংবিধানে রাজ্যপালকে কি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে? কনভেনশন বলেও তো একটা কথা আছে। ইংলণ্ডের কনভেনশন কখনো এমন কাজ সমর্থন করত না। মুখ্যমন্ত্রী রাম রাও মাত্র দুটো দিন সময় চেয়েছিলেন, বিধানসভা ডেকে সেখানে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতেন। রাজ্যপাল তাঁকে সেটুকু সময় দিলেন না, অথচ ভাস্কর রাওকে গদীতে বসিয়ে একমাস সময় দিলেন। ফলে রাজ্যময় অশান্তি। ভিন্ন রাজ্যের যাত্রীরা সে রাজ্যের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না। রামলাল রাজ্যপাল পদত্যাগ করে মান রক্ষা করেছেন, কিন্তু এখানকার কর্তারা সে খবরটা এত দেরিতে পেয়েছেন যে বন্ধ বন্ধ করার অবকাশ পাননি। অগত্যা আমাকে ঘরে বন্ধ থেকে এ প্রবন্ধ লিখতে

হচ্ছে। এখন থেকে এই কনভেনশন চালু হোক যে মুখ্যমন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবী করার আগে রাজ্যপালরা বিধানসভার অধিবেশন ডাকবেন।

এই উপলক্ষে বলে রাখি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশের উপযুক্ত স্থান লোকসভা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরাও সেখানে বিরাজ করছেন। তাঁদের কতক সরকার পক্ষে, কতক বিপক্ষে। সবাই একজোট হয়ে ভোট দিলে পশ্চিমবঙ্গের জনমত সেখানেও প্রতিফলিত হতে পারে। তার জন্যে ট্রাম বাস রেল দোকান বাজার ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অচল করে দিলে জনগণের অনাস্থা প্রমাণিত হয় না, তাদের ঠুঁটো জগন্নাথ বানানো হয়। সেটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়, তাকে বৈপ্লবিক পদ্ধতি বললে বিপ্লবকে খেলো করা হয়। যারা কষ্ট স্বীকার করে পাঠ্যপুস্তক পড়বে না তাদের জন্যে বইয়ের দোকানে 'মেড ইজি' পাওয়া যায়। তাই পড়ে তারা পরীক্ষা দেয়, কিংবা সেটুকু কষ্ট স্বীকারও করে না, পরীক্ষার সময় টোকাটুকি করে। আমাদের ছাত্ররা এ বিদ্যা ভালো করেই শিখেছে। এখন জনগণকে 'বিপ্লব মেড ইজি' শেখানো হচ্ছে। ভালো করে যখন শিখবে তখন কেন্দ্রীয় সরকারের আসন নড়বে না। লোকসভায় তাঁদের ভোটবল যথেষ্ট থাকবে। গণতন্ত্রে ভোট যার মুলুক তার। ভোটের জোরেই বিরোধী পক্ষ মসনদ দখল করবে, সরকার গঠন করবে, নয়তো গণতন্ত্রের পথ ছেড়ে বিপ্লবের পথ ধরতে হবে। সে অতি দুর্গম পন্থা।

প্রত্যেক নাগরিকের দুটো করে ভোট। একটা বিধানসভা নির্বাচনের জন্যে, একটা লোকসভা নির্বাচনের জন্য। কেউ যদি ইচ্ছা করে সে বিধানসভার ভোটটা সি. পি. এমকে আর লোকসভার ভোটটা কংগ্রেসকে দিতে পারে। ভোটদানের এই স্বাধীনতা ভোটারমাত্রেরই আছে। ব্যালট বাক্সে গোপনে ভোট পত্র ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। জানাজানি হবার কথা নয়। জনগণ যে কাকে কোথায় জিতিয়ে দেবে তা কাকপক্ষীও টের পায় না। যদি না কারচুপি হয়। কারচুপি সকলেই অল্পবিস্তর করে। তা সত্ত্বেও ভোট মোটের উপর নির্ভরযোগ্য। অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে আমরা ভারতীয় নাগরিকরা গর্ব করতে পারি যে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার ভাঙি গড়ি। পৃথিবীতে ক'টা দেশে এরকম হয়। আমাদের জনগণ অশিক্ষিত হলেও অসহায় নয়। তারা তাদের ভোটের দাম বোঝে। যারা টাকার জন্যে বিকিয়ে দেয় তেমন লোকও আছে। কিন্তু তারাই সর্বসাধারণ নয়। যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তারা আগে থেকে ফাঁস করে না কাকে ভোট দেবে। কার্যকালে দেখিয়ে দেয় যে সরকার বদল

হয়েছে।

সামনের লোকসভার নির্বাচনের ফলাফল অনিশ্চিত। কেন্দ্রের মসনদ কোন দলের হাতে থাকবে বা যাবে তা দেবতারাও জানেন না। মানুষ জানবে কী করে? বিধান সভার নির্বাচনও একদিন হবে। রাজ্যের গদীতেও রদবদল হবে কি না কে বলতে পারে? জনগণ তো মুখ ফুটে কিছু বলে না, শুধু কান পেতে শুনে যায়। তাদের যা বলবার তা ভোটের বাক্সে চুপি চুপি বলে। বাবুরা বন্‌ধই ডাকুন বক্তৃতাই দিন আর দেয়াল কালোই করুন, ভবী ভুলবে না। ভবীর মনে যা আছে ভবীই জানে। আজকাল তো মেয়েরাও ভোট দেয়। ওদের মনের কথা কি ওদের স্বামীরাও জানে? সুতরাং আমরা সব রকম বিস্ময়ের জন্যে প্রস্তুত। কেবল একটি মাত্র বিস্ময়ের জন্যে নয়। মিলিটারি ডিকটেটরশিপ। কারচুপির সাহায্যে দিল্লীর মসনদ দখল করলে দিকে দিকে বিদ্রোহ দেখা দেবে। তা দমন করার জন্যে মিলিটারিই মসনদ অধিকার করবে।

১৯৮৫

আমার ছেলেবেলা

আমার ছেলেবেলা কেটেছে আমার জন্মস্থান ঢেঙ্কানাল রাজ্যের রাজধানী নিজগড়ে। সেইরকম চব্বিশটি গড় নিয়ে চব্বিশটি দেশীয় রাজ্য। তাদের সমষ্টিকে বলা হয় গড়জাত। গড়জাত হচ্ছে ওড়িশার পাহাড়ী অঞ্চল। সমুদ্র উপকূলবর্তী তিনটি জেলা নিয়ে মোগলবন্দী। যেখানে মোগলরা এককালে রাজত্ব করত। মোগল সরকারে চাকরি নিয়ে আমার পূর্বপুরুষ মোগলবন্দীতে আসেন ও মোগল বাদশাহের দেওয়া তালুক পেয়ে জমিয়ে বসেন। শরিকে-শরিকে ঝগড়া করতে করতে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে আমার ঠাকুরদাকে বালেশ্বর জেলার ভদ্রাসন ছেড়ে সপরিবারে কাজকর্মের খোঁজে বেরোতে হয়। আমাদের বংশে আঠারো বছর বয়সে আমার বাবাই নেন ইংরেজ সরকারের চাকরি। কিন্তু কর্মস্থলে হাই ইংলিশ স্কুল না থাকায় ছোট ভাইদের ইংরেজি পড়াশোনা হয় না। কিছুদিন পরে তিনি ঢেঙ্কানাল রাজ্যে চাকরি পেয়ে সেইখানেই ভাইদের পড়ান। ইংরেজ সরকারের চাকরি ছেড়ে কেউ কখনো দেশীয় রাজ্যে চাকরি নেয় না। রাজকুলের খামখেয়ালের কথা কে না জানে? তবু তিনি সব ঝুঁকি নেন।

তাছাড়া গড়জাত বলতে বোঝায় বাঘ-ভালুকের রাজ্য। কটকে আমার মামার বাড়ি। আমার বড়মামা জীবনে কখনো ঢেঙ্কানালে আসেননি। তাঁর ধারণা রাস্তায় রাস্তায় বাঘভালুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা যে কী করে বেঁচে আছি এটাই তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। শুনেছি আমার জন্মের আগে জঙ্গল আরো বেশি ছিল। তখন নাকি বাঘমামা রাতের বেলা বেড়াতে বেরোতেন। সবাই দরজা বন্ধ করে রাখত। কাছাকাছি জায়গায় বাঘের উপদ্রব মাঝে মাঝে হতো, এটা আমারও জানা। একবার আমাদের বাড়ির সামনের রাজপথে গোরুর গাড়িতে

করে এক বিশালকায় মহাবল বাঘের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যেতে দেখি। মহাবল মানে রয়াল বেঙ্গল। বিশ্রী গন্ধ। কিন্তু কী সুন্দর দেখতে! কে যে তাকে গুলি করে মারে তা হয়তো শুনেছি, কিন্তু মনে নেই। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল রাজা ভিন্ন কিংবা তাঁর অনুমতি ভিন্ন কেউ বাঘ শিকার করতে পারবে না। রয়ালকে রয়াল ভিন্ন মারবে কে?

গড়জাতকে মোগলবন্দীর লোকেরা বলত অন্ধারি মুলুক। অন্ধারি মানে অন্ধকার। অবজ্ঞাসূচক। রাজারা অত্যাচারী, প্রজারা মূর্খ। কিন্তু গড়জাত-বাসীরা চিরকাল স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন। মোগলবন্দীর লোক তো বহু শতাব্দী ধরে বন্দী। অবজ্ঞা করার তারা কে? তারাই তো অনুকম্পার পাত্র। আমিও জন্মত গড়জাতী। তাই গড়জাতের জন্যে আমি গর্ববোধ করতুম। গড়জাত হচ্ছে ওড়িশার হাইল্যাণ্ড। গড়জাতীরা হাইল্যাণ্ডার। আমিও তাই। সকালে ঘুম ভাঙলেই দেখতুম পাহাড়। বিকেলে সূর্য অস্ত যেত পাহাড়ের ওধারে। গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে আগুন ধরে রোশনাইয়ের মতো দেখাত। গায়ে এসে লাগত গরম হাওয়া। কেউ হয়তো পাহাড়ে কাঠ কাটতে গিয়ে জলন্ত বিড়ি বা পিকা ফেলে রেখে এসেছে। তার থেকেই দাবদাহ। অনেক পশুপাখি পুড়ে মরে। দুঃখের বিষয়, কিন্তু রোশনাই কার না নয়নহরণ করে?

আশেপাশে কত গাছ ছিল। বাড়ির সামনের রাস্তার ওধারে দেবদারু গাছ। বাড়ির একপাশে মহানিম। আরেক পাশে তেমনি এক বৃহৎ বৃক্ষ। মনে পড়ছে. না শিমুল না পালধুয়া না কী। তার তলায় ছিল বড়ো বড়ো উইঢিবি আর মনসাসিজের ঝাড়। সাপখোপের ভয়ে আমরা সেদিকে ঘেঁষতুম না। বর্ষাকালে উইঢিবির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসত পাখাগজানো উইপোকা আর তাদের ধরে ধরে খাওয়ার জন্যে অসংখ্য কাঁকড়াবিছে। পরে তারা গর্তে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যেত। আমাদের কিছু করত না। আমরাও কিছু বলতুম না। তবে দুটো একটা পথ ভুলে বাড়িতেও হাজির হতো। বিষ তো তাদের মুখে নয়, ল্যাজে। ল্যাজে রশি বেঁধে ঘোরাতে পারা যেত। তারপর তার বাসায় ছেড়ে দিলে চলত।

সাপের কথায় মনে পড়ে অঁইঠা কেলার কথা। কেলারা এমনিতেই অচ্ছুৎ। তার উপর অঁইঠা। অর্থাৎ এঁটো। যমের অরুচি হবে বলেই অমন নাম রাখা। শুধু কেলার ছেলের কেন, ব্রাহ্মণ, করণ, খণ্ডায়েৎ, নায়েক ইত্যাদি জাতের পুত্রকন্যাদের। কারো নাম হাড়ি, কারো নাম পাণ, কারো নাম ডোম, কারো নাম কণ্ডরা। ইস্কুলে গেলে হাড়িবন্ধু বা হরিবন্ধু, প্রাণকৃষ্ণ বা প্রাণবন্ধু, ডম্বরুধর,

কণ্ডুরি চরণ। তেমনি, হাড়িয়ানি, পালুনি, কেলুনি। ভদ্র নাম কার কী অত মনে নেই। মেয়েরা তো ইস্কুলে আমার সহপাঠী ছিল না। বিয়েও হয়ে যেত দশ এগারো বছর বয়সে। যার কথা বলছিলুম সে কেলাজাতীয় বেদে। ঠিকানা অজানা। বছরে একদিন এসে হাজির হতো। কাঁধে বাঁক। বাঁক থেকে ঝুলছে ছোট বড়ো মাঝারি গোল গোল পেড়ী। বড়োর পিঠে মাঝারি, তার পিঠে ছোট। বাঁকটা নামিয়ে সে একটার পর একটা পেড়ী খোলে আর ফণা তোলে একটার পর একটা সাপ। নানা জাতের, নানা মাপের, নানা রঙের সাপ।

বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে 'ভালিয়া' 'ভালিয়া' বলে সে এক এক করে সাপগুলোকে খেলায়। সাপগুলো ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে আসে, কামড়াতে উদ্যত হয়। সে পাশ কাটায়। হাত দিয়ে ঘাড় চেপে ধরে। ল্যাজ ধরে ঝোলায়। গলায় জড়ায়। আমাদের বলে ধরতে। আমরা শতহস্ত দূরে। সে আমাদের বোঝায় যে সাপগুলোর বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সাপের কামড়ে কেউ প্রাণে মরবে না। কামড়ালে ওষুধ তো তার কাছেই আছে। জারমহুরা। ক্ষতস্থানে লাগালেই বিষ টেনে নেয়। সেই মূল্যবান সামগ্রী সে আমাদের দিয়ে যাবে। সাপে কাটলে ক্ষতস্থানে লাগাব। সঙ্গে সঙ্গে বিষমুক্ত হব। কতই বা দাম! পাঁচ টাকা। তার কাছে আরো একটি মূল্যবান দ্রব্য ছিল। গদ। বাগানে গদ পুঁতলে গাছ হবে। সাপ তার গন্ধ পেলে পালাবে। বাগানও হবে সর্পমুক্ত। কতই বা দাম! এক টাকা না দু'টাকা।

সেলসম্যান হিসাবে অঁইঠা ছিল প্রখর বুদ্ধিমান। আমরা জারমহুরাও কিনতুম, গদও কিনতুম। জারমহুরা যে কী তার বর্ণনা দিতে পারব না। বোধহয় একরকম পাথর। কিন্তু অত কঠিন নয়। তবে ওটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। সাপুড়েদের কাছেই মেলে। কখনো ব্যবহার করার উপলক্ষ জোটেনি। বাগানে গদ পুঁতেছি। সাপ বেরোয়নি, কাকতালীয় কি না কে জানে। অঁইঠা আমাকে বলেছিল সাপ ধরতে শিখিয়ে দেবে। আমি যদি তার সঙ্গে যাই। সাপ একবার সে ধরেও এনেছিল। মুখে হাত ঢুকিয়ে বিষদাঁত ভেঙেছিল। সে জবর জোয়ান। গায়ের রং মিশকালো। তার সাপগুলোর মধ্যে ছিল গোখরো, চিতি, কালনাগিনী ইত্যাদি। বিষম রাগী। চোখে যেন আগুন জলছে। কিন্তু একটারও মাথায় মণি নেই। আমি বলি, "কই, মণি কোথায়? সাপের মাথার মণি। এরা দেখছি মণিহারা ফণী।" সে মুচকি হাসে। "ওঃ। এই কথা! আসছে বার যখন আসব তখুন এনে দেব মণি। তার জন্যে অনেক ঢুঁড়তে হবে,

খোকাবাবু।" আমি বিশ্বাস করি। পরের বছর সে যখন আসে তখন আমাকে নিরাশ করে। বলে, "মনে ছিল না। পরের বার আনব।"

কেলারা যখন আসে তখন দল বেঁধে আসে। সঙ্গে থাকে তাদের স্ত্রীলোকরাও। মাটিতে একটা বাঁশ পুঁতে তারাও কত রকম কৌশল দেখায়। কিন্তু আমার স্মৃতি এ বিষয়ে তেমন স্পষ্ট নয়। হয়তো এটা আমার শোনা কথা। যতদূর মনে পড়ে কাক মারাও কেলাদের ছিল এক অভ্যাস। গুলতি দিয়ে ঐঁঠা বোধহয় আমাদের বাড়ির কাছের গাছ থেকে কাক শিকার করেছিল। কাকের অনুকরণে কা কা করে ডাকলে যত রাজ্যের কাক উড়ে এসে বসত। একটা মরলে আর সব কটা পালাত। এটাও আমার আবছা স্মৃতি। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়েও হতে পারে। আমাদের বাড়িতে রাজ্যের লোক আসত। একবার একদল ইরানী মেয়ে এসে সোজা অন্দরে ঢোকে আর ছোরাছুরি বার করে মাকে দেখায়। তাদের পরণে ঘাগরা। বুলি বোঝা ভার। ওরা চেয়েছিল ছোরাছুরি বিক্রি করতে। মা কী করে বুঝবেন? ভয় পান। আমাদের ছোরাছুরির দরকার ছিল না। বোধহয় একটা কিনতে হয়, নইলে তারা যাবে না। ওদের বিদায়ের পর কে একজন বলেন, "বুঝলে না! ছোরাছুরি বেচাটা ওদের ছল। ওরা এসেছিল ঘরের ভিতরটা দেখে নিতে। কোথায় কী আছে? ফিরে গিয়ে ওদের মরদদের জানাবে। রাতের বেলা মরদরা আসবে চুরি করতে। সাবধান!" সাবধান থাকি। কিন্তু চুরি হয় না। ইরানীরা কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে আসে। কাঁহা কাঁহা মুলুকে যায়। আর কখনো তাদের দেখিনি।

কুম্ভীপটুয়ারা আমাদের বাড়ির সামনের রাজপথ দিয়ে যাওয়া আসা করতেন। মাথায় বিরাট জটা, পিঠে বিরাট তালপাতার ছাতা বাঁধা। পরণে শুধুমাত্র কৌপীন। ওই প্রৌঢ় সাধুরা কথা বলতেন না। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কোথায় যেতেন, কোন্‌খান থেকে আসতেন ওঁদের জিজ্ঞাসা করিনি। তবে শুনেছি ওঁদের ধর্মকে বলে মহিমাধর্ম। ওঁরা যাঁর উপাসনা বা ধ্যান করেন তিনি অলেখ। অলেখ তো শূন্যও হতে পারে। বৌদ্ধ ঐতিহ্য এখনো কোথাও কোথাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ওঁদের গুরুর নাম যতদূর মনে পড়ে ভীম ভোই। যোরন্দা গ্রামে ওঁরা পর্ব উপলক্ষে সমবেত হন। সেইখানেই তাঁর সমাধি। শিষ্যরা জাতপাত মানেন না বলে শোনা যায়। যোরন্দায় মেলা বসে। নানা রাজ্য থেকে বিস্তর লোক আসে। শুনেছি, কিন্তু দেখিনি।

আমাদের বাড়িতে যাঁরা আসতেন তাঁদের কেউ মুসলমান, কেউ খ্রীস্টান, কেউ

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। আশেপাশেই থাকতেন ব্রাহ্ম আর শিখ। আমার ঠাকুর্দা, আমার বাবা সবাইকে অভ্যর্থনা করতেন। সকলের বক্তব্য শুনতেন। আমরা স্বধর্মে বিশ্বাস করলেও পরধর্মে সশ্রদ্ধ ছিলুম। বাড়ির পেছনেই থাকতেন একঘর ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তাঁরাও স্বধর্মে বিশ্বাসী, পরধর্মের সঙ্গে মানিয়ে চলতে জানতেন। আমাদের গোঁড়ামিটা ছিল আচার নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে নয়। বাড়িতে বাইবেল ছিল, একটু বড় হয়ে আমি বাইবেলও পড়ি। গীতা ছিল অ্যানী বেসান্টের অনুবাদ। আচার শিথিল হতো, যখন বোখারী সাহেব সত্যপীরের সিন্নি দিয়ে যেতেন। আমরা কাড়াকাড়ি করে খেতুম। আর আতাহার মিঞা সঙ্গে করে আনতেন অতি উপাদেয় হালুয়া। হিন্দুর বাড়িতে ওরকম হালুয়া হয় না। আতাহার মিঞা উর্দুভাষী মুসলমান অফিসার। আর বোখারী সাহেব যে উর্দুভাষী তা না বললেও চলবে। আর আমাদের প্রতিবেশী কোচম্যান মিঞা যে উর্দুভাষী সেটাও বলে রাখা উচিত। ওড়িশার মুসলমানদের পাঠান বলে পরিচয়। সকলেই উর্দুভাষী। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী পরিবারটি বিহার থেকে আগত।

এদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম পাঠান মাস্টার। তিনি পাঠান হলেও কথা বলতেন বাংলায়। পরতেন ধুতি। গলায় দিতেন কামিজের উপরে চাদর। গোঁফ রাখতেন, দাড়ি রাখতেন না। তখন কি ছাই জানতুম যে তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের খুলনা জেলায় আর তাঁর মাতৃভাষা বাংলা! মুসলমান হচ্ছে সেই যার দাড়ি আছে, যে উর্দুতে কথা বলে। পাঠান মাস্টার ছিলেন কাকাদের বন্ধু তাই আমাদের আর একটি কাকা। রোজ সন্ধ্যাবেলা আসতেন, চা-টা খেতেন, জমিয়ে বসতেন, আড্ডা দিতেন। আমার ছেলেবেলার ফোটোতে দেখি তিনি আমার নবজাত বোনকে কোলে নিয়ে বসেছেন। আর আমি তাঁর একপাশে আলাদা একটা চেয়ারে বসেছি। তিনি আমাদের পরিবারের সঙ্গে এত বেশি একাত্ম হয়েছিলেন যে তাঁর চলে যাবার পর আমরা কেউ তাঁকে ভুলিনি। আমার ছোটকাকা তো আমার বাংলাদেশে চাকরির পর আমাকে বলে রেখেছিলেন পাঠান মাস্টার খোন্দকার সাহেবের খোঁজ নিতে। খুলনায় কখনো বদলি হইনি। তাই খোঁজ নেওয়াও হয়নি। পরে শুনেছিলুম তিনি মাস্টারি ছেড়ে মোক্তারি করেন।

কাছেই মাস্টারের বাসা। মাঝে মাঝে যেতুম। মাস্টারনী ডিম সিদ্ধ করে খাওয়াতেন। কী সর্বনাশ! মুরগীর ডিম। জাত থাকে কী করে! মুরগী

আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় নেই। এমনকি আমাদের মুসলমান প্রতিবেশীর বাড়িতেও না। মুরগীর মাংস প্রথম কবে কোথায় খাই তা মনে পড়ে না, মাছমাংস খাওয়া তো বন্ধ হয়ে যায় বাড়িতে আমার ঠাকুরদার মৃত্যুর পর বাবা আর মা যখন রামদাস বাবাজীর কাছে বৈষ্ণব দীক্ষা নেন। খেতে চাইলে বাগানে গিয়ে লুকিয়ে রেঁধে খেতে হতো। আমরা বহু শতাব্দীর শাক্ত। আমার নামকরণ শাক্ত মতে। আমরা তিন ভাই ও দুই বোন। প্রথম চারজনের শাক্ত নাম, শেষেরটির বৈষ্ণব নামকরণ। তবে এটাও বলে রাখি যে বৈষ্ণব নামও পূর্বপুরুষদের মধ্যে ছিল। আমার বাবার নাম নিমাইচরণ। ঠাকুরদার নাম শ্রীনাথ। শাক্ত আর বৈষ্ণব মিলে মিশে সহ-অবস্থান করে এসেছে।

আমার জন্মের পর থেকে আমি ঠাকুমার কোলেই মানুষ। তাঁর মুখে শুনেছি জন্মের সময় আমার সম্বল ছিল একটি মাথা আর কয়েকখানি হাড়। আমার ভার নিয়ে আমাকে তিনি ডুবিয়ে রাখতেন তেল আর হলুদের গামলায়। সে গামলা পড়ে থাকত উঠনে। সারাদিন রোদ পড়ত গায়ে। একটু একটু করে আমার মাংস লাগে। বেশ কয়েক বছর আমার পথ্য ছিল উঠনে কাঠের আগুনে দোরাঁধা ভাত। তার সঙ্গে আলুসিদ্ধ ও লেবুর রস। ঠাকুমাকেই আমি মা বলতুম আর মাকে খোকার মা। মার কোলে আমার একটি ভাই আসে। সেও ঠাকুমার কোলে মানুষ হয় কিন্তু আমার মতো দুবলা পাতলা নয়। গায়ের জোরে আমাকে হারায়। ঠাকুমার দুই পাশে আমরা দু'ভাই শুতুম আর তাঁর শুকনো মাই টেনে মাতৃস্তন্যের সাধ মেটাতুম। তিনি আমাদের দেশ বিদেশের পুরাণ উপকথা টাটকা খবর শোনাতেন। রামায়ণ মহাভারত থেকে গোলে বকাউলি। মহারানী ভিক্‌টোরিয়া তাঁর স্বামীকে ধমক দিয়ে বলতেন, বেলা হয়েছে, বিছানায় পড়ে আছ কেন? গল্পটা তিনি রসিয়ে রসিয়ে বলতেন। যেন তিনিই এ বাড়ীতে মহারানী আর ঠাকুরদা রাজকুমার আলবার্ট। ঠাকুরদা ছিলেন নিতান্ত গোবেচারি ভালোমানুষ। শরিকদের চক্রান্তে উদ্বাস্তু। আর স্বগ্রামে ফেরেননি। কোথাও শিকড় লাগেনি। কিন্তু গোপালন, গোচিকিৎসা ইত্যাদিতে নিপুণ। তিনিও আমাদের পাশে বসিয়ে কতরকম বিষয় শেখাতেন।

ঠাকুমা যাঁর নিত্য পূজা করতেন তাঁর নাম পুন্নমাসী। পুন্নমাসী যে কার মাসী তা আমাকে কেউ বলেনি, আমিও জানতুম না তিনি কে। বড়ো হয়ে শুনলুম তাঁর প্রকৃত নাম পৌর্ণমাসী। তিনি নামান্তরে যশোদার গর্ভজাত কন্যা

যোগমায়া। মতান্তরে শ্রীরাধার সখী। ঠাকুমা যখন ঠাকুরদার মৃত্যুর বছর কয়েক পরে বড়কাকার সঙ্গে আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে যান তখন তাঁর বিগ্রহটিকেও নিয়ে যান। তার আগেই বাবা গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, নাম রাখেন গৌর গোপাল। ঠাকুমা যখন ছিলেন তখন আমার উপর ভার ছিল কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়ে শোনাবার। আমার বয়স তখন কত? দশের বেশী নয়। কারণ যে বছর প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে সেই বছরই আমাদের বসতবাড়ীর খড়ের চালে আগুন লাগে ও সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীও। আমাদের মাথা গুঁজতে হয় উঠনের ওপারের ঘরগুলোতে। সেগুলো রক্ষা পায়।

আমাদের শক্তি আরাধনা বলতে বোঝাত অসিপূজা। একটা জলচৌকির উপরে শোওয়ানো থাকত বহু পুরুষের পুরাতন অসি, তার সামনে আমাদের পুঁথিপত্র, বেশ মোটাসোটা বলে ইংরেজী শেক্সপীয়ার গ্রন্থাবলীও তার সামিল। এ ব্যাপারে বাবা-কাকারা ছিলেন সম্পূর্ণ উদার। এটা ইংরেজী, ওটা বাংলা এরূপ গণনা তাঁদের ছিল না। বসুধৈব কুটুম্বকম্ আমার আশৈশব শিক্ষা। সেই বয়সেই আমি কাকা ও তাঁর বন্ধুদের জুলিয়াস সীজার ও মার্চেন্ট অভ ভেনিসের অভিনয় দেখি। বেশি নয় এক একটি অঙ্ক। জুলিয়াস সীজারের মৃতদেহের সামনে ব্রুটাস ও অ্যান্টনির বাগ্মিতা। ডিউকের দরবারে পোর্শিয়ার সওয়াল। শাইলকের ছোরা আমার স্পষ্ট মনে আছে। 'আই শ্যাল ফীড ফ্যাট মাই এন্‌সিয়েন্ট গ্রাজ।' বেচারা ছোটকাকা সেবার বেঁচে যান বাঙ্কনিধিবাবুর হাত থেকে, শাইলকের হাত থেকে অ্যান্টনিও।

আমার প্রথম দেখা নাটক বোধহয় 'ধ্রুব'। আমার সমবয়সী দুর্গাচরণ দেখতে আরো ছোট। পরিবারটি দুঃস্থ। স্বাভাবিক অভিনয় করে সে সবাইকে মুগ্ধ করে। এরপর দেখি 'নিমাই সন্ন্যাস'। দেওয়ানবাবুর বাড়িতে অভিনয়। এরপর যখন রাজবাড়িতেও অভিনয় হয় তখন আমার বাবা ব্রাহ্মণ সেজে ইয়া মোটা লাঠি হাতে মারতে যাচ্ছেন রাখালবাবুকে। 'ওহে নিমাই পণ্ডিত, বালক চোর।' বালকটি আর কেউ নয়, সেই দুর্গাচরণ। দুর্গার সৌভাগ্য দেখে আমার হিংসা হয়। তাছাড়া নাটক আরম্ভ হওয়ার আগে রাখালবাবুর মেজ ছেলে মনোরঞ্জন বাঁশি হাতে ত্রিভঙ্গ হয়ে গান করে, 'ফুটিল পীরিতের ফুল'। বাবা ছিলেন রাজবাড়ির থিয়েটারের অবৈতনিক ম্যানেজার। লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁর কাছে নিবেদন করি, 'আমি কেন থিয়েটার করতে পারব না?' পরের ছেলের বেলা যিনি সদয় নিজের ছেলের বেলা তিনি নির্দয়। মনের দুঃখ মনে চেপে রাখতে হয়।

পরে একদিন মনোরঞ্জনরা তাদের দাদামশায়ের বাড়িতে 'মুকুট' অভিনয়ে আমাকে ডেকে নেয়। আমাকে দেয় রাজসভাসদ্ ধুরন্ধরের পার্ট। যুবরাজ নয়, মেজকুমার নয়, ঈশা খাঁ নয়, ধুরন্ধর। ক্ষুণ্ণ হব না? তবু সেই আমার এ জীবনের প্রথম ও শেষ পার্ট।

রাজাসাহেব অকালে পরলোকে যান। তখন আমার বয়স বোধহয় বারো। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন বছরে তিন চারবার নাটক অভিনয় হতো। রংমহলের দর্শকদের মধ্যে আমিও একজন ছিলুম। রাজাসনের এক পাশে মেঝেতে পাতা ফরাসের উপরে গিয়ে বসতুম। অভিনয় শেষ হলে অভিনেতারা রাজবাড়ির একটি কক্ষে ভোজ লাগাতেন। আমিও বসে যেতুম পাত পেতে। ভোজ বলতে এমন কিছু রাজকীয় নয়। লুচি, ছোলার ডাল, ছক্কা তরকারি।

রাজহস্তের পুরস্কার পাওয়া আমার জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য। সাত কি আট বছর বয়সে যখন হাই স্কুলে ভর্তি হই তখন ইংরেজী আমি একেবারেই জানতুম না বললে চলে। প্রশ্নের উত্তরে 'নো' না বলে বলি, 'নট'। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি যে ওটা ভুল। বছর দুয়েক যেতে না যেতে আমার কাকা ও তাঁর বন্ধুরা আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে খাড়া করে দেন রাজা সাহেবের সমক্ষে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায়। আমাকে আবৃত্তি করতে বলা হয় টেনিসনের 'চার্জ অভ দ্য লাইট ব্রিগেড'। চার্জ যে কী, লাইট যে কী, ব্রিগেড যে কী তখন আমার কিছুই জানা ছিল না। হাত পা নেড়ে আবৃত্তি করি, 'ক্যানন টু দ্য রাইট অভ দেম, ক্যানন টু দ্য লেফ্‌ট অভ্ দেম, ক্যানন ইন ফ্রন্ট অভ্ দেম ভলিড অ্যাণ্ড থাণ্ডার্ড'। ব্যস! এর পরে হোঁচট খাই। আমতা আমতা করে দে দৌড়। হাসাহাসি পড়ে যায়। রাজাসাহেব মুচকি হাসেন। আমাকে কেউ প্রম্পট করবার জন্যে ছিলেন না। থাকলে কি অমন বিভ্রাট হতো? যাই হোক, আসল জিনিসটা তো ওই পুরস্কার। সেটা আমি রাজহস্ত থেকে গ্রহণ করি। সেকালের ছ'পেনী দামের একখানা বিলিতী বই। বোধহয় ব্ল্যাকি অ্যাণ্ড সন্সের। মোটা কাগজে বড়ো বড়ো হরফে ছাপা। মনে আছে আমাকে সাহেব সাজতে হয়েছিল। কোট আর হাফ প্যান্ট পরে। যেদিন সকালবেলা পুরস্কার বিতরণ হতো সেদিন সন্ধ্যেবেলা হতো সেই হলঘরেই ভোজ। ছাত্ররা সবাই মিলে আনন্দ করত। যারা পুরস্কার পায়নি সেটাই ছিল তাদের সান্ত্বনা পুরস্কার। অন্যান্য বছর আমারও। এ প্রথা রাজাসাহেবের মৃত্যুর পর রহিত হয়।

দেশীয় রাজ্যে রাজা মহারাজার নেতৃত্ব ছাড়া কোনো পূজাপার্বণই অনুষ্ঠিত

হতো না। বিজয়া দশমীর দিন দশহরার শোভাযাত্রায় তিনিই হতেন পুরোগামী। রথযাত্রাতেও তিনি। দোলযাত্রাতেও তিনি। এইসব উৎসবে অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল পাইকদের। এরা তলোয়ার ছেড়ে লাঙল ধরেছিল। প্রত্যেকেই ছিল নিষ্কর জমির মালিক। ব্রিটিশ শাসনে সৈন্যদল রাখার অনুমতি আমাদের রাজার ছিল না। ওই পাইকরাই একরকম মিলিশিয়া। মাঝে মাঝে রাজধানীতে এসে খেলা দেখাত। তাদের অস্ত্রশস্ত্র বলতে মরচেধরা ভাঙা তলোয়ার বা গাদা বন্দুক। অনুমতি পেলে তাই দিয়ে বাঘ শিকার করত। বা হরিণ শিকার। শিকারের অধিকার একমাত্র রাজার বা রাজবংশীয়দের বা রাজ অতিথিদের ছিল। বিনা অনুমতিতে শিকার করলে জেল বা জরিমানা। বন্যজন্তুরা চাষীদের ক্ষেত খামার ধ্বংস, গোরু বাছুর ধ্বংস করছে শুনলে রাজা বা তাঁর অনুমতি নিয়ে অন্যান্যরা শিকার করতে যেতেন। পাইকরা সাহায্য করত। মাঝে মাঝে হাতি খেদা হতো। বড়ো বড়ো দাঁতাল হাতি ধরা পড়ত। তাদের পায়ে লোহার শিকল পরানো হতো। শিকলপরা দাঁতাল হাতিকে মাহুতরা 'মণ' করিয়ে দোরস্ত করত। 'মণ' করা যে কী ব্যাপার তা আমি জানিনে। বাড়িতে বসে প্রায়ই শুনতে পেতুম হাতিশালা থেকে হাতিদের হুঙ্কার। সেইসব ভয়ানক প্রাণী আমাদের বাড়ির সামনের রাজপথ দিয়ে রোজ যেত পুষ্করিণীতে অবগাহন করতে। একই পথ দিয়ে ফিরে যেত হাতিশালায়। হস্তিনীদের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকত পিয়ারী। যেমন চঞ্চলপিয়ারী। হস্তীদের নাম আমি কিছুতেই মনে করতে পারছিনে। কেবল একটি নাম মনে আছে। মোহনলাল বা মোহনা হাতি। বিষম দুর্দান্ত। মাহুতরা সবাই মুসলমান। ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানরাও তাই। ওরাই পারে দুষ্টু হাতি ও ঘোড়াদের সায়েস্তা করতে গিয়ে জান দিতে। পাইকদের দিয়ে ওসব কাজ হতো না। যার কর্ম তারে সাজে। রাজবাড়ির কুকুর পরিচর্যার জন্যে আস্ত একটা জাতের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা কুকুরিয়া। কুকুরগুলো অবশ্য বিলিতী কুত্তা। দেশী কুকুর সর্বত্র অনাদৃত। তখনো, এখনো।

রাজবাড়ির অদূরেই বলরাম মন্দির। জগন্নাথ মন্দিরের মতো তিন মূর্তিই ছিলেন সেখানে। পরে জগন্নাথের আলাদা একটি বিগ্রহ একই প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত হয়। মা ঠাকুমার সঙ্গে আমিও যেতুম সপ্তাহে একবার কি দু'বার ঠাকুর দেখতে। রথ দেখার চেয়ে কলা বেচাই হতো বেশি। ঠাকুর দেখার পর মন্দিরের বাইরে একপাশে সরে গিয়ে মহিলাতে মহিলাতে কথাবার্তা। জানা অজানা আরো অনেক মহিলা এসে যোগ দিতেন। বলা যেতে পারে মহিলা মজলিস বা

মহিলাদের ক্লাব। আমি তার অনরারী মেম্বর। দিনের বেলা যাঁরা অন্তঃপুরবাসিনী রাতের বেলা তাঁরা মুক্ত বিহঙ্গিনী। কী প্রাণচাঞ্চল্য, কী ফূর্তি! শাশুড়ীরা একদিকে, বৌরা আরেক দিকে। কুমারীরা আরো একদিকে। কুমারীদের কারো কারো বয়স পনেরো ষোল। তখনকার দিনে ব্যতিক্রম। কথোপকথনের বিষয় আমি ভুলে গেছি। আধ্যাত্মিক যে নয় সেটা নিশ্চিত। ঘরসংসার, মেয়ের বিয়ে, পাত্রের সন্ধান, নাতির অসুখ, কর্তার অত্যাচার বা অনাচার, চাকর বাকর, বাজারদর, ভূতপ্রেত, জ্যোতিষী গণনা এমনি কত কথা। একটি ছোট ছেলেকে অকালে পাকাবার পক্ষে যথেষ্ট। বয়সের তুলনায় আমি অকালপক্ক হয়েই পড়ি।

রথযাত্রার সময় সেই মন্দির থেকে তিন বিগ্রহকে রাস্তায় বালিশ পেতে এক বালিশ থেকে আরেক বালিশে লাফাতে লাফাতে নিয়ে যাওয়া হতো রথতলায়। সেই লাফা যাত্রাকে বলা হতো পহণ্ডি। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে রথ তৈরি করা চলত। তিন বিগ্রহের জন্য তিন রথ। রথের পাটাতনের চারদিকে বা ছয়দিকে বসানো হতো ছোট ছোট কাঠের প্যানেল। প্রত্যেকটিতে এক একটি দেব দৈত্য গন্ধর্ব মানুষ বা পশুর প্রতিরূপ। রামায়ণ মহাভারত থেকে নেওয়া। কিংবা কাল্পনিক। লাল নীল হলুদ ইত্যাদি রঙে রঙীন। সুযোগ পেলেই আমরা ছেলেরা গিয়ে পাটাতনের উপর উঠে খেলা করতুম। রথযাত্রা একদিনে সমাপ্ত হতো না। রথ রাস্তার এধারে হেলে পড়ে ঘরবাড়ি জখম করত। সেই আটকে পড়া রথের উপর উঠে কাদের নর্তন? তা কি খুলে বলতে হবে? আমরা চলন্ত রথের উপরেও চড়েছি। আমাদেরও টেনে নেওয়া হয়েছে বামনের সঙ্গে বামনের মতো। রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। রথের উপর বামনকে দেখলে পুনর্জন্ম হয় না। হাজার দশেক দর্শকের যদি পুনর্জন্ম না হয় তবে তার জন্যে আমাদের ধন্যবাদ দিতে হয়। তবে দিনের বেলা আমরা গম্ভীর।

ইয়া ইয়া মোটা দড়ি যারা টানত তারাও ইয়া ইয়া জোয়ান। রাজার আদেশে বেগার খাটতে আসে গ্রাম অঞ্চল থেকে। পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে গেছে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ। বেশির ভাগই গ্রাম থেকে এসেছে রথ দেখতে ও কলা বেচতে। কলা বলতে অনেক সামগ্রীই বোঝায়। মেলা বসে যায়। রথের উপর থাকে একজন সারথি। সে বহুবার এই কাজ করেছে। করতে করতে বুড়ো হয়ে গেছে। তার হাতে এক বন্দুক। ফায়ার করলে রথ চলে। ফায়ার করলে রথ থামে। সে একটার পর একটা ছড়া কাটে আর সেই ছড়া শুনে

মরদরা উদ্দীপ্ত হয়ে রথ টানে আর মেয়েরা শুনে খিলখিল করে হাসে। একটা কি দুটো ছড়া আমার এখনো মনে আছে। কিন্তু লিখতে ভরসা হয় না। বাবু ও বিবিরা বলবেন অপসংস্কৃতি। কী করে বোঝাব যে আমরা গড়জাতীরা ছিলুম মার্শাল রেস? মার্শাল রেসের ঐতিহ্যই হলো অশ্লীল ও অশালীন নৃত্য গীত চিত্র মূর্তি সাহিত্য। ব্রিটিশ আমলে আমাদের নন-মার্শাল বানিয়ে সুসভ্য করা হয়েছে। কিন্তু বাঁধ ভেঙে যায় পালপার্বণের সময়। ধর্মের মুখোশ পরেই আদিম উল্লাস।

বলরাম মন্দিরের মতোই রাতের বেলা রথের আশেপাশে মহিলারা জমায়েত হতেন ও দেবতাদের ভোগরাগ দিতেন। আবার সেইরকম মহিলাদের ক্লাব। আমি তার অনরারী মেম্বর। অনরারী হলেও অনাহারী নই। ভোগের একটা ভাগ তো আমার হাতে পড়তই। আকর্ষণটা কিন্তু ভোজনের প্রতি নয়, মহিলাদের সান্নিধ্যের প্রতি। নারী যে রহস্যময়ী তা আমাকে বই পড়ে শিখতে হয়নি। গ্যেটের 'ভিলহেল্ম মাইস্টারের শিক্ষানবিশি'র মতো আমার শিক্ষানবিশিও ছেলেবেলা থেকেই শুরু হয়। কিন্তু আমার নিজের অজ্ঞাতে। বিদ্যালয়ের পড়ুয়া হিসাবে আমার তেমন সুনাম ছিল না। কারণ পাঠ্যপুস্তকে আমার মন ছিল না। গণিতে গোল্লা পেয়েই আমার বিদ্যারম্ভ। উঁচু পোজিশনও একদিন আমি পাই। কিন্তু ততদিনে আমার ছেলেবেলা সাঙ্গ হয়ে গেছে। ছেলেবেলা বলতে আমি বুঝি বারো বছর পর্যন্ত বয়স।

তবে স্কুলের ছাত্র হিসাবে আমি সবরকম খেলায় যোগ দিতে শিখি। সহ-পাঠীরা ধরে নিয়ে যায় খেলার মাঠে। সাধারণত ফুটবল খেলতে। কখনো কখনো ক্রিকেট। টেনিসও মাঝে মাঝে। ব্যাডমিন্টন তো প্রায়ই। কৃতিত্ব কোনোটাতেই দেখাতে পারিনি। একবারমাত্র পুরস্কার পেয়েছিলুম একটি রুপোর টাকা। ডিম আর চামচের দৌড়ে। সেটাও ফাঁকি দিয়ে। কারণ চামচের বোঁটা ধরে শুরু করলেও পরে একসময় চামচের গলা টিপে ধরেছি। সেটা গর্বের নয়, লজ্জার বিষয়। আমার কিছু কেরামত ছিল সাঁতারে আর গাছে ওঠায়। গাছে উঠে সারাদিন জাম খেয়ে পেট ভরিয়েছি। আর একটা কথা কানে কানে বলছি। কাঁকড়ার গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁকড়া ধরেছি।

আর একটা গুপ্ত কথাও কবুল করি। লুকোচুরি খেলায় আমার ওস্তাদি ছিল। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটি মেয়েকেই আমি প্রত্যেকবার ধরতুম বা ধরা দিতুম। আমার প্রিয় পড়োশিনী। কোথায় যে বিয়ে হয়ে গেল তার।

কী যে হলো পরে, জানিনে। অতি মিষ্টি স্বভাব। কিন্তু আমার প্রথম কবিতার প্রথম প্রেরণাময়ী সে নয়। আরেকটি বালিকা। এটি একটি কলকাতার মেয়ে। খুব স্মার্ট। কিন্তু দেখতে তেমন ভালো নয়। আমাদের ঐ অজ মফঃস্বলে কলকাতার মেয়ে একটি দুর্লভ বিস্ময়। লিখেই ফেলি বাল্মীকির মতো আমার প্রথম শ্লোক। মনে পড়ছে না কী যে ছিল সেই কয় লাইনে। যে কাগজে লিখি সেটাকে এঁটে রাখি দেয়ালের গায়ে। এমন জায়গায় যেটা খুকুমণির চোখে পড়ে। খুকুমণি পড়ে অবাক হয়ে যাবে যে আমি কবিতা লিখতে পারি, আমি একজন কবি। তার চেয়েও বড়ো কথা আমি ওকে ভালোবাসি। ভালোবাসা পেতে চাই। খুকুমণি আমার কবিতার দিকে ফিরেও তাকায় না। তার পড়াশুনাও ততদূর নয়।

বাবা আমাকে ডন বৈঠক শিখিয়েছিলেন। চর্চা করিনি। কাকা শিখিয়েছিলেন ডাম্বেল। চর্চা করিনি। শেষে এক পালোয়ান আসে কুস্তি শেখাতে। হিন্দুস্থানী দারোয়ান। পরমেশ্বর তার নাম। সে আমাকে কুস্তিগীরের মতো কাপড় পরতে শেখায়। তার অনেক কায়দা কৌশল। প্যাঁচের পর প্যাঁচ। মল্ল সেজে কুস্তি করতে গিয়ে বার বার ধরাশায়ী হই। কাউকে ধরাশায়ী করতে পারিনে। লেগে থাকলে হতুম আমি একজন কুস্তিগীর। জীবনে অনেক কিছু হতে চেয়েছি কিংবা আমার গুরুজন চেয়েছেন যে আমি হই। বাবা বলেছিলেন আমি জর্জ ওয়াশিংটন হব। জর্জ ওয়াশিংটন না হয়ে আমি তাঁর দেশের একটি কন্যাকে বিবাহ করেছি। তিনি আশীর্বাদ করেছেন।

১৯৮৬

কলেজ জীবনের স্মৃতি

মা বলতেন, "ছেলে আমার পাশ করে জলপানি পাবে, কলেজে পড়বে, আমি ওকে নিয়ে কটকে থাকব, ওর বিয়ে দেব।" কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে যখন কটক থেকে ঢেঙ্কানালে ফিরছি তখন পথে পাই বাবার চিঠি। সামান্য কয়েকদিনের অসুখে মা আমার মারা গেছেন।

ওটা অসহযোগের আমল। পরীক্ষা দেব না ভেবেছিলুম, কিন্তু গুরুজনের উপরোধে দিয়েই ফেলি। ক্লাসের ফার্স্ট বয়, আমার কাছে সকলে প্রত্যাশা করতেন উচ্চস্থান নিয়ে সাফল্য। সেটা হবার নয়। ওড়িয়ার বদলে বাংলা ভারনাকুলারের প্রশ্নপত্র চেয়ে নিয়ে উত্তর দিয়েছি। অঙ্কেও ভুল করেছি। ওটাই আমার আকিলিসের গোড়ালি। তা ছাড়া আমি আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলুম যে বাবার বোঝা বাড়াব না, বাড়ি থেকে পড়াশুনার খরচ নেব না, নিজের পায়ে দাঁড়াব। সাংবাদিক হবার অভিপ্রায় ছিল। তার জন্যে কলেজে না পড়লেও চলে। কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির নাম জানতুম, তাঁরা কলেজে না গিয়েও ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক বা লেখক। গান্ধীজী কলেজে কিছুদিন পড়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তো আদপেই না। এঁরাও পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

কলকাতায় কাগজের অফিসে ঘোরাফেরা করে হতাশ হয়ে আমি কী করব ভাবছি এমন সময় ছোটকাকার অনুরোধে বাড়ি ফিরে যাই ও তাঁর আশ্রয়ে থেকে কটক কলেজে ভর্তি হই। কী আশ্চর্য! স্কলারশিপও একটা জুটে যায়। মাসে সাত টাকা। পাঁচ টাকা যায় কলেজের মাইনে দিতে। বাকী দু'টাকা জমিয়ে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'য়ের চাঁদা দিই। এমনি করে আমার কলেজ জীবনের সূচনা। মা থাকলে দেখতেন পাশও করেছি, জলপানিও পেয়েছি, কলেজেও পড়ছি, কিন্তু মাকে নিয়ে নয়, বৌকে নিয়েও নয়। আমার সহপাঠীদের মধ্যে অন্তত তিনজন ছিল বিবাহিত।

শুনেছিলুম কলেজে গেলেই ছাত্ররা 'জেণ্টলম্যান' হয়ে যায়। অধ্যাপকরা তাদের সমীহ করেন। বিলেতফেরৎ অধ্যাপক ত্রিপাঠী নাকি সিগারেট অফার করেন। কলেজের এমন দুর্বার আকর্ষণ যে আমার পুরী স্কুলের সহপাঠী পূর্ণ বলত "খরচ চালাতে না পারলে আমি রেলস্টেশনে গিয়ে মোট বইব, তবু কলেজে পড়ব।" বেচারা পূর্ণ! সে পরীক্ষার চৌকাঠই পার হতে পারল না। কলেজে যাবে কী করে? টোকাটুকি করে? সেকাল একাল নয়।

সেই যে কলেজ জীবন আরম্ভ হলো তা কটকে ও পাটনায় ছয় বছর ধরে চলে। বিলেতেও দু'বছর বিভিন্ন কলেজে ক্লাস করেছি। এসব কি সম্ভব হতো, যদি না একটার পর একটা বৃত্তি পেতুম? অর্থাভাবে আমার পড়া বন্ধ হয়ে যেত। কাগজে লিখে নিজেরটা নিজে রোজগার করতে পারতুম, সে আত্মবিশ্বাস আমার সব সময় ছিল। কিন্তু কলেজে না গেলে আমি জ্ঞানীগুণী অধ্যাপকদের সান্নিধ্য পেতুম না। ইউরোপীয় অধ্যাপকদের তো নয়ই। সহপাঠীরাও তো পরে এক একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হন। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাও জীবনের জন্যে তথা জীবিকার জন্যে প্রস্তুতি। তার পর অত বড়ো লাইব্রেরি কোথায় হাতের কাছে পেতুম? কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের এত বিপুল সম্ভার? বিশ্বসাহিত্যের মহাজনদের অশরীরী সঙ্গ?

বই তো আমি কলেজে না গিয়েও পড়তে পেতুম এক জায়গায় না হোক আরেক জায়গায়। কিন্তু সেইসব প্রিয় সহপাঠীদের পেতুম কোথায়? আর সেইসব ছাত্রবৎসল অধ্যাপকদের? যখনি তাঁদের কথা মনে পড়ে তখনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। জীবনের যাত্রাপথে এঁরা এক একজন এক এক ভাবে আমাকে এগিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা বকুনি দিয়েছেন তাঁরাও। যিনি আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়ে ও যিনি সেই রিপোর্ট পেয়ে আমার বৃত্তি আটক করে আমাকে সাজা দিয়েছেন তাঁরাও। তাতে আমার শাপে বর হয়েছে। কিন্তু সেসব কথা আমি বলব না। সুর কেটে যাবে।

গোলামখানা বলে সরকারী কলেজের উপর লোকের অশ্রদ্ধা ছিল। বিশেষ করে ইংরেজ অধ্যক্ষদের পরিচালিত কলেজে। আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য প্রকার। কটক রেভেন্‌শ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন হেনরি ল্যাম্বার্ট। শান্তশিষ্ট মানুষ, কিন্তু কেউ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে শাসন করতেন মৃদু ভাষায়। পরীক্ষার হলে আমি নিজের আসন ছেড়ে পরের আসনে গিয়ে আড্ডা দিচ্ছি দেখে এক মিনিট থ হয়ে দাঁড়ান। তার পর বলেন, "This calls for an explanation."

তাতেই কাজ হয়। সবাই তটস্থ। প্রশ্নপত্র বিলি হয়। লিখতে বসি। কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করে লেখে না। আর-কারো কাগজ দেখে নকল করে না। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করি। ল্যাম্বার্ট কারো কাছে কোনোদিন রাজনীতি নিয়ে কৈফিয়ৎ চাননি। কে কোথায় রাজনীতি করে বেড়াচ্ছে সে খবরও রাখেননি। কলেজ প্রাঙ্গণে রাজনীতি না করলেই হলো। আমার বন্ধু শরৎ আর আমি স্থির করেছিলুম যে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে যাব। আমাদের একজন নেতার প্রয়োজন ছিল। ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেডমাস্টার চাকরি ছেড়ে জেলে যেতে রাজী ছিলেন, কিন্তু তিনি অধ্যাপক নন। আমরা চাই একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। ডক্টর প্রাণকৃষ্ণ পরিজা ছিলেন ওড়িয়াদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় বিদ্বান। পরবর্তীকালে তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইসচ্যান্সেলার ও উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হন। পরিজা বলেন, "আমি তো খুশি হয়েই জেলে যেতুম, কিন্তু বিলেত যাবার সময় সরকারী সাহায্য নিয়েছি যে। সরকারকে কথা দিয়েছি যে ফিরে এসে পাঁচ বছর চাকরি করব। তার আগে চাকরি ছাড়লে কয়েক হাজার টাকা খেসারৎ দিতে হবে।" আমাদের জেলযাত্রা হলো না। চৌরীচোরার ঘটনার পর গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলেন। তার আগে মোতিলাল নেহরু, রাজগোপালাচারী প্রভৃতিকে নিয়ে যে কমিটি গঠন করা হয় সে কমিটির সদস্যরা ভারত পর্যটন করে রিপোর্ট দেন যে দেশ আইন অমান্য আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত নয়। কটকে তাঁদের দর্শন করতে ও তাঁদের ভাষণ শুনতে যে ভিড় হয় সেই ভিড়ে আমরা দু'জনও ছিলুম। আর ছিল বেশ কয়েকজন চেনা-জানা গোয়েন্দা। তবে আমরা তখন চুনোপুঁটি। ল্যাম্বার্টের কানে এ খবর বোধহয় পৌঁছয়নি।

পি. ও. হুইটলক ছিলেন ইংরেজী বিভাগের মাথা। তিনি নিচের ক্লাসে পড়াতেন না। একদিন কে একজন অধ্যাপক আসেননি, তাঁর জায়গায় তিনি এসে আমাদের ক্লাস নেন। সেদিন বোধহয় মিলটনের 'কোমাস' মুখোশ নাট্য পড়ানোর কথা। বই পড়ে আসেননি। টেবিলের উপর বসে হাসি ঠাট্টা করেই একটা ঘণ্টা কাটিয়ে দেন। আমুদে মানুষ। ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলাও করতেন, যতদূর মনে পড়ে। কাউকে কোনোদিন বকেননি। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। ল্যাম্বার্ট বা হুইটলকের চরিত্রে বর্ণবিদ্বেষ ছিল না। ফলে আমাদের মনেও বর্ণবিদ্বেষ স্থান পায়নি।

ইংরেজীর অধ্যাপকদের মধ্যে সর্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী। পড়া নেন কিন্তু উপরের ক্লাসেই। আমাদের পড়াতে কোনদিন আসেননি। আমার কাকারা তাঁর ছাত্র ছিলেন। খুব প্রশংসা করতেন। তাঁর পুত্র ছিলেন আমার সহপাঠী। অমল তার নাম। কলেজের যে দু'জন ছাত্রকে আমি আদর্শ মনে করতুম অমল ছিল তাদের একজন। অপরজন উপরের ক্লাসের ছাত্র সুনীলচন্দ্র পালিত। শুধু বিদ্যায় নয়, স্বভাবেও এঁরা শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অমল পরে কলকাতার মেডিকাল কলেজে পড়ে ডাক্তার হন ও কলকাতায় চিকিৎসা করেন। আমি যখন কলকাতায় বদলী হয়ে আসি প্রয়োজন হলে তাঁরই শরণাপন্ন হই। তিনি হাসিমুখে চিকিৎসা করেন। ফী নেন না। তাঁদের ওখানে মাঝে মাঝে হাজির হই। গোপালবাবু আমার কাকাদের মনে রেখেছিলেন। সেই সুবাদে আমিও তাঁর স্নেহের পাত্র হই। তাঁর স্ত্রীও আমার স্ত্রীকে স্নেহ করতেন। গোপালবাবু আমাকে একদিন একটা চমক দেন। বলেন, "ভগবান আছেন কি না জানিনে। তাঁকে তো আমি দেখিনি। আমার প্রত্যক্ষ দেবতা আমার পিতা, মাতা ও পত্নী।" পিতামাতার কথা তো অশ্রুত বা অপঠিত নয়। কিন্তু পত্নীর কথা ওই একজনের মুখেই শুনেছি। কত বড়ো একটা শিক্ষাই তিনি আমাকে দিলেন। এই পতিদেবতার দেশে পত্নীদেবতা! নারীকে দেবী তো কত লোকেই বলে, তাঁরাও নিজেদের নামের সঙ্গে জুড়ে দেন। কিন্তু নারীকে যখন বিবাহ করতে যান মাতৃদেবীকে বলেন, "মা, তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি।"

যদুনাথ সরকারই ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। উপরের দিকে পড়াতেন। একদিন আমাদের ইংরেজীর ক্লাস নিতে আসেন অন্য একজনের বদলে। এসেই প্রথমে চক নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে তাঁর বক্তব্য লেখেন। তিনটি স্তম্ভে। তার পরে দেন বক্তৃতা, যার ইচ্ছে সে ব্ল্যাকবোর্ড দেখেই নোট করে নেয়। সেদিনকার পাঠ্য কী ছিল মনে নেই। বোধহয় গদ্য গ্রন্থ "The Great Englishmen of the Sixteenth Century।" যদুনাথ বোধহয় সার ফিলিপ সিডনী সম্বন্ধেই বলেন। তিনি ইংরেজীর এম. এ। চাকরির শুরু সেই সুবাদে। কিন্তু শেষটা ইতিহাসের অধ্যাপক তথা অথরিটি হিসাবে। তিনি পাটনায় চলে যান ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক হয়ে। তাঁকে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসেও স্থান দেওয়া হয়। সেই বয়সেও তিনি ফুটবলের রেফারি হয়েছিলেন কটকে। তাঁর পুত্র সত্যেন ছিল আমাদের সহপাঠী। তাকে তিনি স্যাণ্ডহার্স্টে পাঠান

মিলিটারি শিক্ষার জন্যে। কঠোর সাধনা। সত্যেন ব্যর্থ হয়।

মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন আমাদের সংস্কৃতের অধ্যাপক। তিনি ইংরেজী জানতেন না, ওড়িয়াতেই পড়াতেন। তাঁর কাছে পড়েছি কালিদাসের 'রঘুবংশে'র দুটি সর্গ। যতদূর মনে পড়ে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ। রাম সীতাকে নিয়ে বিমানে করে ফিরছেন আর সমুদ্রের দৃশ্য বর্ণনা করছেন। 'দূরাদ্ অয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেঃ।' হয়তো ভুল হল। নম্বর কাটা যাবে। অনুস্বর বিসর্গের ভুল হবার ভয়ে আমি সংস্কৃত নিতে চাইনি। সংস্কৃত নিয়েছি ইতিহাস আর লজিকের সঙ্গে আর কোন কম্বিনেশন ছিল না বলে। নিয়ে ভালোই করেছি। সাহিত্যিকের পক্ষে সংস্কৃত জ্ঞান অপরিহার্য। অনুস্বর বিসর্গের জন্য নম্বর কাটা না গেলে বেশ নম্বর ওঠে। মুখস্থ করতে হয়। তা লজিকেও কি মুখস্থ করার প্রয়োজন হয় না? 'বারবারা সেলেরাণ্ট ডেরিআই ফেরিও' কত পরিশ্রম বাঁচিয়ে দেয়! ইতিহাসের তারিখগুলো আমি একটা কাগজে টুকে দেয়ালে এঁটে রাখতুম। দেখতে দেখতে মুখস্থ হয়ে যেত।

মহামহোপাধ্যায় সাদাসিধে মানুষ, মৃদুভাষী, নির্বিরোধ। ধুতীর উপরে পরতেন একটা বগলবন্ধ জাতীয় জামা। সেটাও সাদা। একটা সাদা চাদরকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জামার সঙ্গে বাঁধতেন। সর্বদা গম্ভীর। কিন্তু একদিন বেধে যায় আমার সঙ্গে তর্ক। বিষয়টা নারীর অধিকার, পুরুষের সঙ্গে সাম্য। একালের ছেলেরা যেমন কট্টর কমিউনিস্ট সেকালে আমিও ছিলুম তেমনি কট্টর ফেমিনিস্ট। আমাদের কলেজ ম্যাগাজিনে ইংরেজীর লেকচারার শচীন্দ্রলাল দাস বর্মা লেখেন এক কবিতা। 'An Anti-Feminist Cry'. আমি তার উত্তরে লিখি 'A Feminist Counter Cry।' তিনি কী মনে করেন জানিনে। মহামহোপাধ্যায় তর্কে ক্ষান্তি দিয়ে আমাকে ইশারায় ডাকেন। তিনি ক্লাস শেষ করে বেরিয়ে যান, আমি তার সঙ্গ নিই। বারান্দায় যেতে যেতে বলেন, "তুমি তর্ক করলে কী হবে? প্রকৃতি ওদের ওই রকম করে গড়েছে। রমণের সময় রমণীদের স্থান থাকে নিম্নে।" আমি বোবা বনে যাই। প্রাচীন পণ্ডিতদের এটাই বোধহয় ছিল তর্কের পদ্ধতি। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' যদিও বাড়ীতে ছিল, তার গীত অংশ যদিও আমি শুনতে অভ্যস্ত ছিলুম, তবু কবিতা অংশ আমি পড়ে দেখিনি। নইলে বিপরীত বিহারের উল্লেখ করে তাঁকেই তাঁর অস্ত্রে পরাস্ত করতুম। যাক্, এসব ক্ষেত্রে মুখ না খোলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কলেজ ম্যাগাজিনে আমার ইংরেজী রচনা নিয়মিত ছাপা হতো। বাইরেও

বিভিন্ন বাংলা আর ওড়িয়া পত্রিকায়। তাছাড়া আমাদের ক'জনের একটা হাতেলেখা পত্রিকাও ছিল। সেটা ত্রিভাষী। তিনটে ভাষাতেই আমি লিখতুম। লিখতে লিখতে আত্মবিশ্বাস জন্মায়। সেটা আমার শিক্ষানবিশীর বয়স। তার জের চলে পাটনায়। কটকে দু বছর পড়ে শরৎ আর আমি পাটনা চলে যাই আমার প্রধান আকর্ষণ যদুনাথ সরকার। ইতিহাস আমার প্রিয় বিষয়। কিন্তু অনার্সের কোর্স দেখে বিশ্বাস হয় না যে ফার্স্ট ক্লাস পাব। তাই ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে পড়ি। যথাকালে লক্ষ্যভেদ করি। কিন্তু যদুনাথের কাছেও ইতিহাস পড়তে হয়। পাস কোর্সের একটা পেপার। ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুদ্ধ। প্রিয় পেপার। যদুনাথের সান্নিধ্য আমি দিল্লী, আগ্রা এক্সকারসনের সময় বিশেষভাবে পাই।

অর্থনীতির প্রখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন সি জে. হ্যামিলটন। আমাদের পড়াতেন পাস কোর্সের ইকনমিক্স। সেমিনার লাইব্রেরীর চাবি তিনি নিজের হাতেই রাখতেন। বই ধার করতে যেতুম বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'রোডস টু ফ্রীডম' চাইতে তিনি প্রশ্ন করেন, 'এ বই নিতে চাও কেন?' উত্তর দিই, 'উনি একজন অ্যাডভান্সড থিঙ্কার।' তিনি বলেন, 'ওই যে গঙ্গানদী দেখছ কেউ যদি ওর গর্ভে তলিয়ে যায় সেটাও কি অ্যাডভান্স করা নয়?' আমি এর উত্তর দিতে পারিনে। মনে হলো হ্যামিলটন রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ্। পরে তিনি দেশে ফিরে গিয়ে কো-পার্টনারশিপ নিয়ে কাজ করেন। পাটনায় শুনি তিনি ব্যর্থ প্রেম ভুলতে মদ ধরেন। বছর পঞ্চাশ বয়সেও অনূঢ়।

আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল ভি. এস. জ্যাকসন তখন ছুটিতে। তাঁর পদে কাজ করছিলেন অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ই. এ. হর্ন। তিনি অর্থনীতির ক্লাসও নিতেন। একবার তিনি আমাদের হস্টেলে এসে সবাইকে জড় করে বলেন কী একটা বিষয়ে সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সামনেই দশ কি পনেরো মিনিটের মধ্যে ইংরেজীতে একটা প্রবন্ধ লিখতে। যারা কলম কাগজ নিয়ে বসে যায় তাদের একজন আমিও ছিলুম। তিনি প্রবন্ধগুলো যথাস্থানে পাঠান। আমিই প্রথম হই। এর জন্যে একটা প্রাইজ দেবার কথা। দিতেন পাটনা ডিভিসনের কমিশনার বি. সি. সেন। বিশ টাকার প্রাইজ। আমি বলি, আমি টাকা নিয়ে কী করব? আমাকে একটা বই দিলে মনে থাকবে। নাম করি রম্যাঁ রলাঁর 'জন ক্রিস্টোফার'। উপন্যাসের খানিকটা আমার কটকেই পড়া ছিল। বিরাট গ্রন্থ। মূল ফরাসীতে দশ খণ্ড। ইংরেজী অনুবাদে চার খণ্ড। দাম

পঁচিশ টাকা। প্রিন্সিপাল কমিশনারকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কি আরো পাঁচ টাকা দিতে রাজী হবেন? তিনি রাজী হন। তখন আমার হাতে আসে রলাঁর সেই নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত উপন্যাস। আমিও ভাবতে আরম্ভ করি বাংলা ভাষায় তেমনি বৃহৎ ও তেমনি মহৎ এক উপন্যাস কি লেখা যায় না? লিখবে কে? কেন, আমি? আমাকে তা হলে তিনটে ভাষায় লেখা ছেড়ে একটা ভাষাতেই একনিষ্ঠ হতে হয়। ওড়িয়াতেও কবিতা লিখে আমার বেশ নাম হয়েছিল। আমার ইংরেজী রচনাও তো কটকের মতো পাটনার কলেজ ম্যাগাজিনেও নিয়মিত বেরোত। বাংলায় মনোনিবেশ করার ফলেই 'পথে প্রবাসে' লেখা হয়।

হর্ন সাহেব আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বিলেত যাবার সময় আমার হাতে লণ্ডনে তাঁর বোনের নামে একখানা চিঠি দেন। মিসেস ব্রিজার্ড আমাকে নিমন্ত্রণ করে চা খাওয়ান, নিকটেই অবস্থিত টেট গ্যালারিতে নিয়ে গিয়ে চিত্রসম্পদ দেখান। তাঁর স্বামীর সঙ্গেও পরিচয় হয়। লেবার পার্টির সভ্য। পার্লামেণ্টে যাবার জন্যে সচেষ্ট। হর্ন কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।

আমাদের ইংরেজী বিভাগের প্রধান জে. এস. আর্মারও ছিলেন স্কটল্যাণ্ড অধিবাসী। আমাকে একদিন বলেন, 'আমি তোমার বাপের মতো। যখন যা জানতে চাইবে অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করবে।' এটা ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা উপলক্ষে। দশ বছর বাদে পাটনা যাই। তখন তিনি প্রিন্সিপাল আর আমি বাংলাদেশে কর্মরত আই. সি এস অফিসার। আমাকে দেখেই তিনি চিনতে পারেন। স্বয়ং ঘুরে ফিরে পাটনা কলেজ দেখান। হল ঘরে পুরাতন কৃতী ছাত্রদের ফোটো সাজানো ছিল। বলেন, 'ভবিষ্যতে তোমার ফোটোও এখানে স্থান পাবে।" সেদিন আজও আসেনি। আর্মার সাহেব আমাকে একটা হিতোপদেশ দিয়েছিলেন। "ফাইনাল পরীক্ষার আগের মাসখানেক বইপত্র পড়বে না। সব ভুলে যাবে। মাথার কাজই করবে না। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষার আগে গ্রামে গিয়ে এক চাষীকে বলি আমাকে কায়িক পরিশ্রমের কাজ দিতে। খড়ের গাদা থেকে দুই হাতে খড় সরাই। মজুরের মতো খাটি। চাষী আমাকে খোরাক জোগায়। ওদের সঙ্গে ওদের মতোই থাকি।"

বলা বাহুল্য আমি ওঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিনে। শেষদিনটি পর্যন্ত, শেষ মিনিটটি পর্যন্ত পড়েছি বা সম্ভবপর প্রশ্নের উত্তর মুসাবিদা করেছি। খেতে গেছি

বই হাতে করে। পড়তে পড়তে খেয়েছি। খেতে খেতে পড়েছি। সবাই উপহাস করেছে। রাত জাগতে জাগতে অনিদ্রায় অভ্যস্ত হয়েছি। তার পর তার ক্লান্তি কাটিয়ে উঠেছি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে, ঘণ্টাখানেক সাঁতার কেটে। ওর মতো দাওয়াই আর নেই। হস্টেল থেকে পা বাড়ালেই গঙ্গা। পাটনায় আমি গোড়ায় ছিলুম 'প্রবাসকুটির' নামক একটি মেসে। এর পরে যাই মিণ্টো হিন্দু হস্টেলে। শেষে মিণ্টো মহামেডান হস্টেলে। সেইসূত্রে মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। মহামেডান হস্টেলে থাকলেও খাওয়াদাওয়া হতো হিন্দু হস্টেলের বাঙালী হিন্দু ছাত্রদের মেসে। রান্না করত কপিলদেও বাবাজী। আমার বন্ধু বাবাজীকে বলেছিল আমাকে ভালো করে খাওয়াতে। আমি যদি পাশ করি আমি ওকে মোটা বকসিস দেব। বাবাজী তার যথাসাধ্য করেছিল। মাছটা-মাংসটা অকৃপণ হাতে পরিবেশন করেছিল। বিলেত যাবার সময় তাকে বকসিস পাঠিয়ে দিই।

কটকেও শেষের দিকে আমি হস্টেলে আশ্রয় নিই। কাকা অন্যত্র চাকরি নেন। কটকের হস্টেলেও মেস সিস্টম ছিল। আমার ঢেঙ্কানালের বন্ধু দুর্গাচরণ পট্টনায়ক সে মেসের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মকর্তা। তার পরিচালনায় আমাদের মেস অন্যান্য মেসের তুলনায় এত ভালো চলে যে যারা ঢেঙ্কানালের ছেলে নয় তারাও সে মেসের মেম্বার হতে চায়। কিন্তু মেসের খাবার আমার কোনোখানেই কোনোদিনই পছন্দ হয়নি। বাড়ীর খাবারই আমার পছন্দ। বছর পাঁচেক মেসের খাবার খেয়ে আমাকে কোনো মতে প্রাণ ধারণ করতে হয়। কেবল ছুটির সময় বাদে।

কটকের মতো পাটনাতেই কয়েকজন সহপাঠী পাই যাঁরা সহপাঠীরও বেশী। যাঁরা অন্তরঙ্গ বন্ধু। কটকে যেমন কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, বৈকুণ্ঠনাথ পটনায়ক, হরিহর মহাপাত্র, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র বড়াল, পাটনায় তেমনি কৃপানাথ মিশ্র, ভবানী ভট্টাচার্য, ফজলুর রহমান, কৃপাসিন্ধু মিশ্র। কলেজ জীবনের পরেও বিলেতে এঁদের সঙ্গে আবার দেখা। দেশে ফিরে আসার পরেও সম্পর্ক বজায় থাকে। কিন্তু দেখাসাক্ষাৎ বা চিঠিপত্র কমে আসে। সংস্কৃত ভাষায় একটি শ্লোক আছে। তার মর্ম এই সংসারে বিষবৃক্ষের দুটিমাত্র অমৃত ফল আছে। কাব্যরসাস্বাদন ও সাধুসঙ্গ। আমার বেলা সাহিত্যরসাস্বাদন ও বন্ধুসঙ্গ। তবে আমার বেলা দুটিমাত্র নয়। আরো একটি। প্রিয়জনসঙ্গ।

১৯৮৫

ইস্পাতের কাঠামো

উক্তিটা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসকে তিনি বলেছিলেন 'স্টীল ফ্রেম'। প্রায় দু শো বছর ধরে এই সার্ভিস বা এর পূর্ববর্তী বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস, মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিস, তথা বম্বে সিভিল সার্ভিস এত বিশাল সাম্রাজ্যকে শক্ত হাতে ধরে রাখে। অসামরিক প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে এর করায়ত্ত। আর্মি ব্যতীত অন্য সর্বত্র এর সভ্যদের প্রাধান্য।

মোগল বাদশাহদেরও একটা সিভিল সার্ভিস ছিল। তবে সামরিক বিভাগের কাছে অসামরিক বিভাগ ছিল খাটো। এখন যেমন হয়েছে পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে। ব্রিটিশ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছে স্বাধীন ভারত, মোগল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী স্বতন্ত্র পাকিস্তান তথা স্বতন্ত্র বাংলাদেশ।

কিন্তু ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের উত্তরাধিকারী খুঁজলে পাকিস্তানে পাওয়া যেতে পারে, বাংলাদেশের কথা বলতে পারব না, কিন্তু ভারতে লোপ পেয়ে গেছে। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একটা জুডিসিয়াল ব্রাঞ্চও ছিল। একজি-কিউটিভ ব্রাঞ্চই একমাত্র নয়। হাই কোর্টের জজদের তিন ভাগের একভাগ নিযুক্ত হতেন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জুডিসিয়াল ব্রাঞ্চ থেকে। জেলায় যেমন একজন কলেক্টর তথা ম্যাজিস্ট্রেট থাকতেন তেমনি একজন জজও থাকতেন। দুই ব্রাঞ্চের দুই কর্তৃপক্ষ। ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে রাজ্যকে ভাগ করা হয় জেলার ভিত্তিতে। তার আগে ছিল পরগণার ভিত্তি। প্রত্যেক জেলায় রাজস্ব আদায় করার জন্যে একজন ইংরেজ কলেক্টর নিয়োগ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বা কিছুদিন পরে আর একজন ইংরেজ অফিসারকে পাঠানো হয় দেওয়ানী ও ফৌজদারি আদালত পরিচালনা করতে। তিনি একাধারে জজ ও

ম্যাজিস্ট্রেট। কলেক্টর তাঁর কাচারিতে আর জজ তাঁর আদালতে সর্বেসর্বা। কিছুকাল পরে দেখা গেল জজ সাহেব ঘুরে বেড়াতে পারেন না, তিনি স্থিতিশীল। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হলে, পুলিশের থানা পরিদর্শন করতে হলে, কান মলে খাজনা আদায় করতে হলে একজন গতিশীল ম্যাজিস্ট্রেট চাই। নতুন কোনো অফিসার না পাঠিয়ে কলেক্টরকেই ম্যাজিস্ট্রেট পদ দেওয়া হয়। তাঁর সাগরেদ হন একজন জুনিয়র অফিসার। তাঁকে বলা হয় জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তিনিও ইংরেজ।

ক্রমশ কাজ বেড়ে যায়। প্রজাদের সুবিধার জন্যে জেলাকে মহকুমার ভিত্তিতে ভাগ করা হয়। এক একটি বিরাট জেলায় দুটি বা তিনটি বা চারটি মহকুমা সৃষ্টি হয়। চব্বিশ পরগণায় তো পাঁচটি মহকুমা, প্রদেশ ভাগের পরে ছ'টি। প্রত্যেক মহকুমায় একজন করে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু কোথায় এতগুলি ইংরেজ সিভিলিয়ান? অগত্যা ভারতীয়দের জন্যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ প্রবর্তন করা হয়। তাঁরা ডেপুটি কলেক্টরও বটে। তাঁদের সার্ভিসের নাম রাখা হয় প্রোভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস। ওদিকে জজেরও তো কাজ বেড়ে যাচ্ছিল। তাঁরও তো সহযোগী দরকার। মুনসেফ বলে একটা পদ আগে থেকেই ছিল। সেটা মোগল আমলের। সে পদে নবশিক্ষিত দেশীয় যুবকদের নিয়োগ করা হয়। তাঁদের সার্ভিসের নামও প্রোভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস, কিন্তু তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় জুডিসিয়াল। মুনসেফদেরও প্রত্যেক মহকুমায় মোতায়েন করা হয়, কোথাও দু'জন করে। মহকুমার সদর ছাড়া অন্যত্র তাঁদের জন্যে 'চৌকি' ছিল। তাতে লোকের সুবিধা। তাঁদের অসুবিধা।

মহকুমা হাকিমদের কাজ বেড়ে যায়। তখন তাঁদের সাহায্য করার জন্যে একজন বা দু'জন সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তথা সাব ডেপুটি কলেক্টর পাঠানো হয়। এঁদের সার্ভিসের নাম সাবর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস। এমন কর্মই নেই যা এই বেচারিদের দিয়ে করানো না হয়। অথচ এঁদের মাইনে সবচেয়ে কম। ইদানীং এঁরাও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। শতাব্দীব্যাপী অবিচারের প্রতিকার হয়েছে। আমি যখন নওঁগা মহকুমার সাবডিভিজনাল অফিসার তখন আমার সেকেণ্ড অফিসার ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাব-ডেপুটি। তাঁর হাতেই অফিসের কাজকর্ম সঁপে দিয়ে আমি চলে যেতুম গ্রামে গ্রামে ঘুরতে। গ্রামেই ডেরা বাঁধতুম। একজন অনরারি ম্যাজিস্ট্রেটকেও প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে পুলিশ কেস বিচার করতে

দেওয়া চলত না। তিনি করতেন বেসরকারী অভিযোগের বিচার। যাকে বলে কমপ্লেণ্ট কেস। কুস্টিয়া মহকুমায় একজন সাব-রেজিস্ট্রারকে অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট করে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর এজলাসে পুলিশ কেস পাঠাতে আপত্তি ছিল না।

পুলিশ কেস সম্বন্ধে কড়াকড়ির কারণ ছিল। আসামীকে খালাস দিলে বা যথেষ্ট শাস্তি না দিলেও পুলিশ থেকে বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিরুদ্ধে উপর-ওয়ালাদের কাছে লাগানো হতো। আমাকেও এরজন্যে জবাবদিহি করতে হয়েছে। পুলিশের আস্পর্ধাও কম নয়। থানার পরিদর্শনের খাতায় বাঁকুড়া জেলার ইংরেজ পুলিশ সাহেব আমার পূর্ববর্তী মহকুমা হাকিমদের রায়ের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন। আমিও সেই খাতাতেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি। ব্যাপার অনেকদূর গড়ায়। ইংরেজ কমিশনার আসেন জেলা পরিদর্শনে। পুলিশ সাহেবের অতিথি হন। তিনি গায়ে পড়ে আমার বিরুদ্ধে লেখেন। আমি ছুটি নিই। অন্যত্রও পুলিশ আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে, যিনি করেছেন তিনি ইংরেজ ডি. আই. জি। চীফ সেক্রেটারি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন আমার কেসগুলো পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিতে। তিনি তথ্য ও সংখ্যা উদ্ধৃত করে রিপোর্ট দেন যে আমার কোর্টে শতকরা সত্তরজনের উপর আসামী শাস্তি পেয়েছে ও শাস্তি যথেষ্ট কড়া।

প্রত্যেকটি উপরওয়ালার উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত নির্দেশ পুলিশ কেসে যত বেশী শাস্তি হয় তত ভালো, যত ডিটারেণ্ট শাস্তি হয় তত ভালো। সফল ম্যাজিস্ট্রেট যাঁরা তাঁদের একজন আমাকে বলেছিলেন, "তুমি যত পারো শাস্তি দাও, ওরা আপীলে খালাস হবে। তোমার ভাবনা কিসের?" আমার ভিতরে একটা জুডিসিয়াল বিবেক ছিল। তাই আমি পুলিশের মুখ চেয়ে শাস্তি দিইনি। আবার একজন ম্যাজিস্ট্রেটও ছিল যে কড়া হাতে অপরাধ দমন করতে চায়। একবার ম্যাজিস্ট্রেট, একবার জজ, এমনি করে আমাকে পরীক্ষা করার পর উপর-ওয়ালারা জজই করেন। সেখানেও পুলিশের সঙ্গে অপ্রীতি একই কারণে কিন্তু হাইকোর্ট আমারি পক্ষে।

একই সার্ভিসে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট থাকায়, একই অফিসার পর্যায়ক্রমে দুই পদে কাজ করায় প্রশাসনের উভয় দিকই একজনের পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল। পুলিশের সঙ্গে আমার বোঝাপড়াও হয়েছিল। পুলিশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই কর্তব্যপরায়ণ সৎ লোক। দোষ যা তা সিস্টেমের।

যারা সত্যিকার অপরাধী তারা আইনের ফাঁক দিয়ে সহজেই পার পেয়ে যায়। অপরাধ প্রমাণ করা তো পুলিশের দায়। সাক্ষ্য যথেষ্ট না হলে বা আইনে ফাঁক থাকলে পুলিশ করবে কী? উকিলেরা আসামীকে খালাস করিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। তা সে যত বড়ো শয়তানই হোক। কখনো কখনো সাক্ষী হাত করে নেন। সরকারী উকিল যা পান আসামীর উকিল তার চেয়ে ঢের বেশী পান। ফী আরো বাড়িয়ে না দিলে সরকারের কাজ করতে বড়ো বড়ো উকিলেরা রাজী হন না। পুলিশের অসুবিধা অনেক বলেই পুলিশ বাধ্য হয়ে বাঁকা রাস্তায় চলে। আশা করে হাকিমও চোখ বুজে দোষী সাব্যস্ত করবেন ও কঠোরতম দণ্ড দেবেন। মামলা ফেঁসে গেলে পুলিশকেই তো জবাবদিহি করতে হয়। পাবলিক চটে যায়।

এর প্রতিকার কি ম্যাজিস্ট্রেটদের হাত থেকে বিচারভার কেড়ে নিয়ে মুনসেফদের হাতে দেওয়া? পরিদর্শনের ভার কি জজের উপরে দেওয়া? জানিনে আজকাল ক'জন জজ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের কাজকর্ম পরিদর্শন করেন, থানায় গিয়ে পুলিশের কাজকর্ম পরিদর্শন করেন। আজকাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোডের কয়েকটা শান্তিরক্ষার ধারায় নিবদ্ধ। তাঁরা বিচারও করেন না, আপীলও শোনেন না। শান্তিভঙ্গ না হলে তাঁরা অপরাধ দমনে উদাসীন। ক'জন অপরাধী ধরা পড়ল, ক'জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হলো, ক'জন শাস্তি পেল, সে শাস্তি যথেষ্ট গুরুতর কি না এসব এখন তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। যাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত তাঁরা কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য কিনা আমি তো জানিনে। আজকাল কেস চলে যায় সরাসরি হাইকোর্টে বা সুপ্রীম কোর্টে। না, এ সিস্টেমও আমার মতে নিখুঁত নয়। এতে অপরাধ বাড়ছে বই কমছে না। আমরা তো নিয়মিত জেল পরিদর্শন করতুম। বিনা বিচারে কেউ কোন দিন আটক থাকলে তার বিচার ত্বরান্বিত করতুম বা তাকে খালাস দিতুম। বত্রিশ বছর বিনা বিচারে জেলখানায় পচছে, সুপ্রীম কোর্ট না জানলে প্রতিকার হচ্ছে না, এ রকম ব্যাপার তো একটি দুটি নয়। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কি কেস ডায়েরিতে নোট করে রাখেন না কোন্ কোন্ কেস বছরের পর বছর ঝুলছে। সামান্য গাফিলতির জন্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই. সি. এস থেকে অপসারিত হন। আজকাল ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের কোনো জুডিসিয়াল ব্রাঞ্চ নেই। এক্জিকিউটিভ অফিসাররা বিচারাধীন আসামীর জন্যে দায়ী নন। দায়ী তা হলে কে? জুডিসিয়াল সার্ভিসের অফিসাররা?

ক্ষমতা কেড়ে নিলে দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। বিচারাধীন কয়েদীকে অন্ধ করে দেওয়া হলো, অথচ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানলেন না, জেলা জজও অন্ধকারে। আগেকার দিনে মহকুমা হাকিমরা সপ্তাহে দু'তিন দিন জেল পরিদর্শন করতেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা মাসে একদিন। জেলা জজেরাও তিন মাসে একদিন। এ দায়িত্ব এখন কাদের উপর বর্তেছে? জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরা তো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরাও তাই। এখনও কি তাঁরই নিয়ন্ত্রণে? না কারো নিয়ন্ত্রণে নন? লোকে অরাজকতার কথা এত বলছে, কিন্তু রাজা রাজড়ার তো লেখাজোখা নেই। ব্যুরোক্রাসী আরো বর্ধিষ্ণু। মন্ত্রীসংখ্যাও তো বর্ধনশীল। হিসাব নিলে দেখা যাবে আগেকার দিনের স্টীল ফ্রেমের পেছনে ঢের কম খরচ হতো। ফৌজদারি মামলা বিলম্বিত হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে বকুনি খেতে হতো। বিচারকারী হাকিমকেও, তদন্তকারী পুলিশকেও। আজকাল কি তিনি কোর্ট ও থানা পরিদর্শন করেন? সুরেন্দ্রনাথের কার্যকালে হপ্তায় হপ্তায় বকেয়া মামলার স্টেটমেণ্ট পেশ করতে হতো। আজকাল কি সে প্রথা বহাল আছে?

স্টীল ফ্রেমের মধ্যমণি ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তথা কলেক্টর। তাঁর নজর ছিল জুডিসিয়াল ভিন্ন অন্য সমস্ত বিভাগের উপরে। তাঁর কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টকে এইসব বিভাগের প্রধানরা সকলেই ডরাতেন। তাঁদের প্রমোশনও নির্ভর করত এর উপরে। এই পদটি মোগল আমলে ছিল না, এটা ব্রিটিশ আমলেরই প্রবর্তন। কেবল জজই ছিলেন তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে। জজের অধীনস্থ অফিসারদের সম্বন্ধে জজই রিপোর্ট পাঠাতেন। ক্রমে ক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপালিটি, স্কুল বোর্ড ইত্যাদি বেরিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর মনোনীত ব্যক্তিরা এসব প্রতিষ্ঠানে থাকতেন। সেই সূত্রে মহকুমা হাকিম হিসাবে আমিও ছিলুম জেলা বোর্ডের সদস্য। ভোটদানের অধিকারও আমার ছিল। হস্তক্ষেপ না করেও কণ্ঠক্ষেপ করতে পারা যেত। বোর্ডের কর্মকর্তাদের গলদ দেখিয়ে দেবার সুযোগ তো ছিলই।

আজকাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নাকি জেলা বোর্ডের অন্যতম কর্মকর্তারূপে আজ্ঞাধীন করা হয়েছে। ঠিক বলতে পারব না, কারণ আমি তেত্রিশ বছর হলো সরকারী পরিমণ্ডলের বাইরে। সতেরো বছর হলো জেলা থেকেও দূরে। কলকাতা থেকে বীরভূম বহু দূর। তা ছাড়া আমার কোনো চাড় নেই। একটা বিশেষ

বয়সের পর বাণপ্রস্থই বিধেয়। সৃষ্টির কাজ অসমাপ্ত পড়ে আছে। তবে দেশ বিদেশের সংবাদপত্র আমি নিয়মিত পড়ি। দেশ বিদেশের খবর রাখি। কিন্তু জেলাগুলির সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন। অতীতের সঙ্গে তুলনা করব তো? কী দরকার বিভিন্ন পার্টির সমালোচনা করে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস সরকারী নীতি নির্ধারণ করার ভার মন্ত্রীমণ্ডলের, কিন্তু সে নীতি কাজে পরিণত করার ভার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি দায়িত্বশীল অফিসারদের। তাঁদের ক্ষমতা কমিয়ে দিলে দায়িত্বও কমিয়ে দেওয়া হয়। তার পরে যদি তাঁদের বকাঝকা করা হয় তবে সেটা অন্যায়। আপনি কোথায় যাবেন, বলুন। ড্রাইভার আপনাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যদি তার হাত থেকে স্টীয়ারিং হুইল কেড়ে নেন তা হলে তাকে বকুনি দেওয়া তার উপর অবিচার নয় কি? আপনি সম্ভবত একজন সর্বজ্ঞ পুরুষ, কিন্তু আপনার দলের লোকেরাও কি একজন অভিজ্ঞ অফিসারের চেয়ে জ্ঞানবান? আগেকার দিনে আমাদের একটা পলায়নের পথ ছিল। আমরা জজ হতে পারতুম। এখন সে পথ খোলা নেই। ম্যাজিস্ট্রেটরা কেউ পরে জজ হতে পারেন না। এটা তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব করে। তবে সদাশয় সরকার আজকাল বিশ বছর চাকরির পর পুরো পেন্সনে অবসর নিতে দেন। বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর বয়সে পুরো পেন্সনে অবসর নিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করা সম্ভব। অনেকেই এই পথে পলায়ন করছেন। ফলে সরকারকে কাজ চালাতে হচ্ছে অভিজ্ঞ অফিসারদের জায়গায় তরুণ অফিসারদের দিয়ে। এঁরাও দেখতে দেখতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে প্রমোশন পাচ্ছেন। পুলিশেও একই দৃশ্য। তার পর এরা চটপট সেক্রেটারি হচ্ছেন। ইস্পাতের কাঠামো কি এইভাবে রক্ষা করা সম্ভব? হতে পারে যে ইস্পাতের কাঠামোর সঙ্গে দেশবাসীর উপর অত্যাচার জড়িত ছিল। সুতরাং গেছে, আপদ গেছে। গোটা আই. সি. এসটাই একই দিনে গেলে আরো ভালো হতো। কয়েকজন আরো কিছুকাল থেকে গেলেন কেন?

পাণ্ডের সঙ্গে আরো দশজন আই. সি. এস ও আগেকার দিনের মতো আই. পি. এস অফিসার থাকলে পাঞ্জাবের প্রশাসন হয়তো এমনভাবে ভেঙে পড়ত না যে আর্মিকে ডাকতে হতো ও রাখতে হতো। ব্রিটিশ আমলে আর্মিকে কখনো কখনো ডেকে আনলেও সিভিল পাওয়ারকে অতখানি পাওয়ারলেস করতে হয়নি। হয়েছিল সম্ভবত সিপাহী বিদ্রোহের সময়। তার পরে পাঞ্জাবে ১৯১৯ সালে একবার মার্শাল ল জারি করা হয়। সেই সময়েই জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে। কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল আবার এক সিপাহী বিদ্রোহ ঘটছে

যাচ্ছে। চারদিক থেকে প্রতিবাদ ওঠায় মার্শাল ল রহিত হয়। এবার মার্শাল ল জারি হয়নি। তা না করে যতদূর যাওয়া চলে ততদূর যাওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে না ভুল হয়েছে সে বিচার আমি করব না। আমি শুধু ক্ষুন্ন হচ্ছি একথা শুনে যে সিভিল অফিসারদের পাইকারীভাবে পাঞ্জাব থেকে রাজ্যান্তরে বদলী করার প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। আই এ. এস তথা আই. পি. এস অফিসারদের সবাইকে না হোক অধিকাংশকেই সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল বা নরম বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। শুনছি অন্যান্য রাজ্য থেকে বদলি হয়ে এঁদের জায়গায় যেতে বিশেষ কেউ রাজী হচ্ছেন না। তাই যদি হয় এঁরাই শেষপর্যন্ত থেকে যাবেন ও বহুলোকের অনাস্থাভাজন হবেন। পাণ্ডে মানে মানে সরে পড়েছেন। তিনি আগেই অবসর নিয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে পদত্যাগটা জীবিকাত্যাগ নয়। অপরের পক্ষে সেটা জীবিকাত্যাগ, কারণ আগেকার মতো তাঁরা জজ হয়ে রেহাই পেতে পারেন না। শুনেছি পাকিস্তানে এখনো সে নিয়ম বলবৎ রয়েছে।

আমি যখন প্রথমবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হই তখন দেখি আমার কনফিডেন-শিয়াল বাক্সয় একটি পুস্তিকা রয়েছে। তাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে আর্মিকে ডাকলে আর্মির কমাণ্ডারই হবেন আমার চেয়ে বড়ো, আমি হব তাঁর চেয়ে ছোট। নিজের বিচার বিবেচনা অনুসারে তিনি কাজ করবেন, হুকুম দেবেন, আমার বিচার বিবেচনা অনুসারে নয়। আর্মির হাতে পরিস্থিতিটা ছেড়ে দিলে ওরা কাকে ধরবে, কাকে মারবে তা ওরাই জানে। অথচ লোকে দায়ী করবে আমাকেই। আসল ব্যাপার আর্মি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ হচ্ছে প্রাদেশিক সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই তাঁর জেলায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আর্মির হাতে পরিস্থিতি তুলে দিলে তিনি আর শ্রেষ্ঠ নন। কমাণ্ডারই শ্রেষ্ঠ। হয়তো তিনি একজন লেফটন্যাণ্ট কর্নেল কি মেজর। আমার চেয়ে তাঁর র‍্যাঙ্ক নিচে। কেন আমি নিজের অপমান নিজে ডেকে আনব? আমি সাবধান হই। ব্রিটিশ আমলে আর্মিকে কখনো ডাকিনে।

পার্টিশনের পর আমাকে জেলার ভার দিয়ে যেখানে পাঠানো হয় সেটা একটা সীমান্তবর্তী জেলা। নদী পার হয়ে পাকিস্তানীরা এসে হামলা করত। নদীর চরও পাকিস্তানের বলে দাবী করত। নদীপথ দিয়ে নৌকা গেলে আটক করত ও মাঝিদের ধরে নিয়ে যেত। পুলিশ ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না

দেখে আমি মিলিটারিকে স্মরণ করি। ডাকিনি, শুধু একবার দেখে যেতে বলেছি। সেইসূত্রে ব্রিগেডিয়ার, মেজর জেনারল না লেফটনাণ্ট জেনারল ও আরো কয়েকজন বিবিধ নিচের র‍্যাঙ্কের অফিসার। তাঁদের পরামর্শ, "মিলিটারিকে ডাকলে মিলিটারি আসবে ঠিকই, কিন্তু অপর পক্ষেও তো মিলিটারি আসবে। আমাদের পক্ষের একজন জওয়ানও যদি মারা যায় তবে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে। আপনি কি সেটা চান?" আমি বলি, "না। তা হলে উপায়?" তাঁরাই পরামর্শ দেন রাজ্য সরকারের সশস্ত্র পুলিশকে ডাকতে। সশস্ত্র পুলিশ এলে আমার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে ভয় দেখান। "সার, পুলিশ কি মরতে এসেছে? একটিও পুলিশের লোক যদি মরে তবে সমস্ত পুলিশ বিদ্রোহ করবে।"

রাজ্য সরকার সশস্ত্র পুলিশ পরিচালনার জন্যে পাঁচজন অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমার অধীনে নিযুক্ত করেন। এঁরা সবাই প্রাক্তন মিলিটারি অফিসার। একজন উইং কমাণ্ডার, একজন লেফটনাণ্ট কর্নেল, দু'জন মেজর, একজন ক্যাপ্টেন। আমরা সুচিন্তিত কৌশলে চর দখল করি যাতে একটিও মানুষ না মরে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারা গেল না। একটা চর ছিল যেটার মাঝখানেই সীমান্তরেখা। একখানা ঘরের এক অংশ ভারতে, অপর অংশ পাকিস্তানে। পুলিশে পুলিশে সঙ্ঘর্ষ। আমাদেরই একটি কনস্টেবল মরে। আমার অনুশোচনার অবধি থাকে না। ওটা দখল করতে না গেলেই হতো। কিন্তু আমি তো সে সময় সেদিকে ছিলুম না। চার্জে যিনি ছিলেন তিনি ছেলেমানুষ। আর তিনিই যখন চার্জে তখন আমি হস্তক্ষেপ করি কী করে? মিলিটারি বা আধা-মিলিটারিকে ডাকার এইখানেই বিপদ। অনর্থ একটা ঘটবে, তখন আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।

আরো এক কাণ্ড ঘটে। অন্য একটা চর দখল করতে গিয়ে আরেক অফিসার সীমান্তরেখা পার হয়ে যান। দেখেন রেখার ওপারে কতকগুলি কুটির, তাতে বাস করছে যারা তারা পাকিস্তানী নাগরিক। আমার সহকর্মী তাদের খেদিয়ে তো দিলেনই, তাদের কুঁড়ে ঘরগুলিতেও আগুন লাগিয়ে দিলেন। আমাকে জানালেন যে ওরা নিজেরাই নিজেদের ঘরে আগুন দিয়ে পালিয়েছে। আমি সরল বিশ্বাসে রিপোর্ট পাঠালুম সেই মর্মে। দৃশ্যটা ওপার থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব প্রভৃতি নিরীক্ষণ করছিলেন। তাঁদের রিপোর্ট আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমার কাছে যে রিপোর্ট পেয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গ সরকারকে জানিয়ে দেন যে সত্য আমাদের দিকে। অত তুচ্ছ

ঘটনা নিয়ে অবশ্য যুদ্ধ বেধে যায় না। কিন্তু বাধতেও তো পারত। আমাদের কেসটা সব সময় ঠিক হওয়া চাই। আমি তো প্রাক্তন মেজরকে অভিনন্দন করে সকলের সামনে তাঁর সাহসের প্রশংসায় মুখর, এমন সময় সংশ্লিষ্ট সাব-ডিভিজনাল অফিসার আমার কানে কানে বললেন, 'মেজর সাহেব স্বহস্তে আগুন ধরান। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। লোকগুলো প্রাণের ভয়ে পালায়।'

না, মিলিটারিকে বা প্রাক্তন মিলিটারি অফিসারদের হাতে কখনো সর্বময় ক্ষমতা তুলে দিতে নেই। যুদ্ধের সময় সব কিছুই চলে, শান্তির সময় চলে না। হাইকোর্ট উঠে যায়নি, সুপ্রীম কোর্ট উঠে যায়নি। তাঁদের কাছে যে কোনো ব্যক্তি বিচার প্রার্থনা করতে পারে। মিলিটারি নেসেসিটি বলে আইনের শাসন থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। তা করতে গেলে আইনটাই বদলে দিতে হয়। স্বৈরতন্ত্রী পাকিস্তানে ওসব সম্ভব, এদেশে গণতন্ত্র বিদ্যমান। যখন গণতন্ত্র ছিল না তখন ব্রিটিশ ভারতে কত কী হয়েছে, কিন্তু সেসব আইন বাঁচিয়ে। ওরা যে কারণে এতকাল ছিল সেটা আইনের শাসন। অরাজকতার চেয়ে আইনের শাসন ভালো, এইজন্যেই ভারতের লোক সেটা সহ্য করেছিল।

আইনের শাসনের জন্যেই সিভিল সার্ভিস দরকার। মোগলরাও এটা বুঝত। তাদেরও একটা সিভিল সার্ভিস ছিল। তাদের সিভিল সার্ভিসের শতকরা পঞ্চাশ জন আমলা ছিলেন বিদেশী ইরানী, তুরানী প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান। বাকী পঞ্চাশ জনের অর্ধেক ছিলেন দেশীয় মুসলমান ও অর্ধেক রাজভক্ত হিন্দু। উচ্চতর পদগুলি সাধারণত বহিরাগত মুসলমানদের জন্যেই বাঁধা। তাঁরা অবসর নেবার পর যে যার দেশে ফিরে যেতেন, কিন্তু এদেশের সম্পত্তি ওদেশে নিয়ে যেতে পারতেন না। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। সেইজন্যে থেকেই যেতেন বেশীর ভাগ। ভারতকেই স্বদেশ মনে করতেন। ভারতের ধন ভারতেই থাকত। মোগল রাজত্ব এতকাল থাকার সেটাও একটা কারণ। বলা বাহুল্য, ইংরাজরা এ দেশের ধন ওদের দেশে নিয়ে যেতেন। তাঁরা এদেশে থাকবেন না বলে স্থির করেই এদেশে আসতেন।

গোড়ার দিকে সিভিল সার্ভিসের শতকরা একশোটা পদই ছিল ওদের। কিন্তু রাণী ভিক্টোরিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারত সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করার সময় যে ঘোষণাপত্র দেন তাতে ভারতীয় প্রজাদের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। তখন বিলেতে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় ভারতীয় প্রজাদেরও বসতে দেওয়া হয়। উচ্চ স্থান অধিকার করতে পারলে তাঁদেরকেও

সমান শর্তে চাকরি দিতে হয়। প্রথম দিকে কম ভারতীয়ই বিলেত গিয়ে সফল প্রতিযোগী হতেন। কিন্তু পরে তাঁদের সংখ্যা বাড়ে। তখন গাত্রদাহ আরম্ভ হয়। ইচ্ছে করে নিয়মকানুন এমনভাবে বদলে দেওয়া হয় যে এখানকার পড়া শেষ করে ওখানে গেলে দেখা যেত প্রতিযোগিতায় বসার বয়স পার হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙালীর বুদ্ধির সঙ্গে এঁটে ওঠে কার সাধ্য! বাপেরা ছেলেদের পাঠিয়ে দিতে লাগলেন পনেরো ষোল বছর বয়সে বা আরো আগে। শ্রীঅরবিন্দকে তো পাঁচবছর বয়সে। তখন এমন কোনো নিয়ম ছিল না যে পরীক্ষায় বসার আগে গ্রাজুয়েট হতে হবে। ইংরেজদের ছেলেরাও গ্রাজুয়েট না হয়েই প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারতেন। যথা, সার হেনরি হুইলার, বিহার ওড়িশার গভর্নর। ভারতীয় প্রতিযোগীরাও যে কখনো সফল হতেন না তা নয়। পরে হৈ চৈ পড়ে যায়। নিয়মকানুন আবার বদলায়। কিন্তু ভারতীয় প্রতিযোগীদের সংখ্যা আরো বাড়ে। বাঙালীরা যদিও অগ্রণী তবু অন্যান্য প্রদেশবাসীরাও পেছিয়ে থাকে না। শেষের দিকে ইংরেজরা একটা সীমা বেঁধে দেয়। শতকরা পঞ্চাশ জন হবে ইউরোপবাসী ব্রিটিশ প্রজা, আর সকলে ভারতবাসী ব্রিটিশ প্রজা। তাদের মধ্যে কতক মাইনরিটি সম্প্রদায়ভুক্ত। এটা চালাতে গিয়ে দেখা গেল বিলেতে গিয়ে যাঁরা প্রতিযোগিতায় সফল হচ্ছেন তাঁদের সংখ্যাই অধিক থেকে অধিকতর হচ্ছে। তাঁদের ঠেকিয়ে রাখার কোনো ভদ্র উপায় নেই। কালক্রমে ইংরেজ সিভিলিয়ানরাই মাইনরিটি হবেন, প্রমোশন পেয়ে ভারতীয়রাই তাঁদের উপরওয়ালা হবেন। অকল্পনীয়! অসহ্য! প্রতিযোগিতা তো তুলে দেওয়া যায় না। সার্ভিসটাকেই গুটিয়ে নেওয়া হোক। ক্ষমতার হস্তান্তর মানে আই. সি. এসের বিলোপ। যাঁরা থাকেন তারা আই. এ. এস হিসাবেই গণ্য হন। যদিও চাকরির শর্ত আগের মতো। পরে শর্তের খেলাপ হয়। অবসর গ্রহণের বয়স কমিয়ে দিয়ে তাঁদের বিদায়। যে দুটি একটিকে গভর্নররূপে পুনর্নিয়োগ করা হয় তাঁদের মধ্যে ব্রিজকুমার নেহরুকে অকারণে কাশ্মীর থেকে বদলি করা হয়, ভৈরবদত্ত পাণ্ডেকে পাঞ্জাব থেকে সরে যেতে হয়। মিলিটারির সঙ্গে জুত হয়নি নিশ্চয়।

অপরপক্ষে স্বাধীনতার পরে কোনো কোনো আই. সি. এসের ভাগ্যে যা মিলেছে তা স্বপ্নের অধিক সৌভাগ্য। ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে তাঁরা লণ্ডনে, ওয়াশিংটনে, মস্কোতে, টোকিওতে, প্যারিসে, বনএ নিযুক্ত হয়েছেন। ইউনাইটেড নেশনসে ভারতের প্রতিনিধি হয়েছেন। গভর্নর তো হয়েছেনই। সবচেয়ে আহ্লাদের কথা আশি বছর পার হলেও কেউ কেউ এখনো চাকরি করে যাচ্ছেন।

যথা, ব্রিজকুমার নেহরু। সত্তর ছুঁই ছুঁই হয়েও ভৈরবদত্ত পাণ্ডে এই সেদিন পর্যন্ত চাকরি করেছেন। বয়সের সীমা ষাটের জায়গায় আঠান্ন করে যদি অনেককে লাঞ্ছিত করা হয়ে থাকে তবে বেছে বেছে কতককে তো সম্মানিত করা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে কেউ কেউ ষাট বছরের আগে গভর্নর বা বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য পদে অভিষিক্ত হতেন, সেই ক'জনই ষাটের পরেও দু'তিন বছর চাকরি করতে পারতেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে যেক্ষেত্রে রাজনীতিকরা হালে পানি পান না সেক্ষেত্রে আই. সি এস নিয়োগ না করে আর কী উপায় আছে? মিলিটারি অফিসার নিয়োগ? যেমন পাকিস্তানে হয়। না, এদেশে এখন পর্যন্ত সিভিল পাওয়ার সর্বোচ্চ। এরজন্যে আমরা সকলেই গৌরব বোধ করতে পারি। সিভিল পাওয়ারই সর্বোচ্চ থাকবে। মহাত্মা গান্ধী আমাদের সতর্ক থাকতে বলে গেছেন, সিভিল পাওয়ার বনাম মিলিটারি পাওয়ার এই দ্বন্দ্ব ভারতেও দেখা দিতে পারে। তাঁর প্রয়াণের পরে দেখা দিয়েছেও, কিন্তু ভারতে নয়, তার দুই বিচ্ছিন্ন অঙ্গে। পাকিস্তানে তথা বাংলাদেশে। তাদের সর্বোচ্চ আইন বলতে বোঝায় সামরিক আইন। পাকিস্তানে তার অনুপান হচ্ছে শরিয়ত আইন। ভারতে আমরা হয়তো দেখব মনুসংহিতার পুনর্জন্ম।

স্টীল ফ্রেম গণতন্ত্রের সঙ্গে বোধহয় খাপ খায় না। অন্তত প্রাচ্য দেশে। বৃদ্ধ আই. সি. এসদের দেহত্যাগের পর এরও বিলয় ঘটবে হয়তো। তবে এর দুটো কি একটা প্রথা যদি চলিত থাকে তা হলে গণতন্ত্রের দিক থেকে না হোক জাতীয়তাবাদের দিক থেকে সুরাহা হবে। নয়তো নেশনটাই ভেঙে পড়বে। আগেকার দিনে কেউ দাবী করতে পারতেন না যে তাঁকে তাঁর নিজের প্রদেশেই নিয়োগ করতে হবে, যেহেতু তিনি নিজের ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়োগ করা হয়েছিল বম্বেতে, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে যুক্তপ্রদেশে, আলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাদ্রাজে। তেমনি বাংলাদেশে নিয়োগ করা হয়েছিল বেনেগল নরসিংহ রাওকে, নীলকণ্ঠ মহাদেব আয়ারকে, মোতিরাম খুশিরাম কৃপালানীকে। এঁরা ইণ্ডিয়ান হয়ে ইণ্ডিয়ায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, বাঙালী হয়ে বাঙলার বাইরে না, অবাঙালী হয়ে বাঙলায় না। আজকাল তো রাজ্য সরকারই ধুয়ো ধরেছেন যে বাইরে থেকে কেউ নিযুক্ত হবেন না। মোক্ষম যুক্তি তাঁরা আঞ্চলিক ভাষা বোঝেন না। সেকালে ইংরেজরাও আঞ্চলিক ভাষা শিখতে বাধ্য হতেন। এটা কোনো যুক্তিই ছিল না। কিন্তু সরকারী কাজকর্ম চলত ইংরেজীতে। ইদানীং সেটা অচল হওয়ায় এক মহা

সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর সমাধান কি বলকানীকরণ? না হিন্দীকরণ? প্রথমটাতে উত্তর ভারতের সুবিধা, দ্বিতীয়টাতে দক্ষিণ ভারতের। পূর্ব ভারতের মতিগতি দুর্বোধ্য। স্টীল ফ্রেম না হোক, ফ্রেম তো একটা থাকবে। না সেটাও থাকবে না?

১৯৮৪

নৈরাজ্যবাদীর আত্মকথা

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে" তখন সেটাই হয় নৈরাজ্যবাদীর মনের কথা। শুধু "এই রাজার রাজত্বে" টুকু বাদে। নৈরাজ্যবাদীরা তাদের মাথার উপরে রাজা বলে আর কাউকে স্বীকার করে না। নিজেরাই বা পরস্পরকে রাজা বলে স্বীকৃতি দেবে কেন? তা হলে দাঁড়ায় তারা কেউ সত্যি সত্যি রাজা নয়। প্রজাও নয়। এমন এক রাষ্ট্রের নাগরিক যেটা রাষ্ট্রই নয়। সমাজও তো সমাজপতিদের দ্বারা শাসিত নৈরাজ্যবাদী বা আর এক কদম এগিয়ে নৈসমাজবাদী, যদি ঐ শব্দটা শুদ্ধ হয়।

এর জন্যে বেশী দূর যেতে হবে না। এই কলকাতা শহরেই, এই পশ্চিমবঙ্গেই শত শত তরুণকে দেখতে পাবেন যারা না মানে রাষ্ট্রকে, না মানে সমাজকে। মানে পরস্পরকেও না। হয়তো মানে মা কালীকে। ডাকাতরাও মানে। খুন জখম এদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। এণ্ডস আর মীনস নিয়ে এদের কোনো মাথা ব্যথাও নেই। নৈরাজ্যবাদের পেছনে যে দার্শনিক তত্ত্ব আছে তাও এদের অজানা। এদের আজকাল সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। এক এক দেশে এদের এক এক নাম। কোথাও শোনা যায় না যে এরা অহিংস। অথবা সত্যনিষ্ঠ।

কতরকম মতবাদ ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে গজিয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, ধনতন্ত্রবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, সামন্ততন্ত্রবাদ, গণতন্ত্রবাদ, র‍্যাডিকালিজম, কমিউনিজম, ফাসিজম ইত্যাদি। তেমনি আরো একটি মতবাদ নৈরাজ্যবাদ। এর যা বক্তব্য তা এক কথায় এই যে, রাষ্ট্র সোভরেন নয়, সমাজ সোভরেন নয়, ব্যক্তিই সোভরেন। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে এই মতবাদের যথেষ্ট সমর্থন আছে। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য কবি, দার্শনিক, নীতি-

শিদ্ এই মতবাদের সুরে সুর মিলিয়েছেন। শেলীর কবিতা আমাকে এদিকে আকৃষ্ট করে। তাঁর 'প্রমিথিউস আনবাউণ্ড' কাব্যের নায়ক মানুষকে আগুন এনে দিয়ে দেবরাজের রোষে পড়েছেন। তাঁর যকৃৎ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে একটা ঈগল। তাঁকে শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছে একটা শিলার সঙ্গে। যুগের পর যুগ অতীত হয়েছে। তিনি অনমনীয়, অদম্য। শেষে হারকুলিস এসে তার বন্ধন মোচন করেন।

মনে রাখতে হবে যে তিনি একক, কেউ তার সঙ্গে নেই। না দেবতা, না মানব। অথচ মানবদের জন্যেই তাঁর এ দুর্ভোগ। মানবরা দেবরোষকে বড়ো ভয় করে। দেবতাদের অত্যাচার নিয়তি বলে মেনে নেয়। মানুষকে আগুন না দেবার নিয়ম যদি না থাকে তবে তুমি কে হে, সে নিয়ম ভঙ্গ করবে? নিয়ম। নিয়মই এ জগৎ শাসন করছে। নিয়ম ভঙ্গ মহাপাপ। শেষে কি নরকে যাব?

উনবিংশ শতাব্দীর এই দেবদ্রোহী তথা রাজদ্রোহী মানসিকতা ফরাসী বিপ্লবেরও পূর্বের। অষ্টাদশ শতকের এনলাইটনমেণ্ট। দেবদ্বিজে ভক্তি সেই সময়েই টলে যায়। নতুন সমাজবিন্যাসের জন্যে যতরকম মতবাদের জন্ম হয় তাদের একটি এই নৈরাজ্যবাদ। গোড়ায় এর সঙ্গে অরাজকতার বা হিংসার কোনো সম্পর্ক ছিল না। যেমন খ্রীস্টের ও আদি খ্রীস্টানদের ধর্মের সঙ্গে। তবে নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী কিছু লোক ছিলেন। তাই এরা সহজেই সন্দেহভাজন হন। নির্যাতনের উত্তরেই হোক আর নিজেদের হঠকারিতায়ই হোক নৈরাজ্যবাদীরা হিংসার মার্গ ধরেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করেন, রাষ্ট্রপতিকে মেরে রাষ্ট্রকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দেখা গেল নৈরাজ্যবাদী বলতে লোকে বোঝে একদল সন্ত্রাসবাদী যাদের অভীষ্ট হচ্ছে মাৎস্যন্যায়। যে মাৎস্যন্যায়ের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য রাজার, রাজসৈন্যের, কোটালের, শাসনকর্তার, বিচারশালার ও কারাগারের প্রয়োজন হয়েছিল। ফাঁসী কাঠ বা বধ্যভূমিরও। বহু শতাব্দীর বিবর্তনের ফলে যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে যদি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দ্বারা তছনছ করা হয় তবে তার নীট ফল হবে মিলিটারি ডিকটেটরশিপ। সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ক'টা অস্ত্রই বা আছে বা থাকতে পারে! তারা অস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিংও পায়নি। সাধারণের সহানুভূতি ছাড়া তাদের আর কোনো পুঁজি নেই। সেটা যদি লোপ পায় তবে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

নৈরাজ্যবাদের নতুন ব্যাখ্যার আবশ্যক ছিল। টলস্টয় তার একটা নতুন ব্যাখ্যা দেন। রাষ্ট্রের চারটি স্তম্ভ হচ্ছে প্রথমত সৈন্য, দ্বিতীয়ত ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ, তৃতীয়ত জজ ও আদালত, চতুর্থত জেল ও ফাঁসী। এই চারটি স্তম্ভের চূড়ায় থাকেন রাজা বা প্রেসিডেণ্ট। তাঁর পক্ষ ও বিপক্ষ মিলিয়ে প্রজাদের নির্বাচিত পার্লামেণ্ট বা কংগ্রেস। কিন্তু পক্ষ বিপক্ষ উভয়েই নিজেদের তৈরি আইনকে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার করেন। টলস্টয় ও গান্ধী দু'জনেই পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। দু'জনেই অহিংস নৈরাজ্যবাদী। মাৎস্যন্যায়ের বিরোধী। এঁদের আস্থা জনগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের উপরে। যেমন পঞ্চায়েৎ।

শেলীর মতো কবিদের সঙ্গে আমার মনের মিল থাকলেও আমার মতের মিল হয় টলস্টয়ের সঙ্গে, গান্ধীর সঙ্গে। বিশেষ করে গান্ধীর সঙ্গে, কারণ তিনি কাজের লোক। যা ভাবেন তা কাজে পরিণত করেন ও করিয়ে নেন। জনগণ তাঁর পেছনে। শিক্ষিত শ্রেণীও তাঁর সঙ্গে। দুর্লভ যোগাযোগ। কিন্তু তিনি যাঁদের নেতা হয়ে কাজ করেন তাঁরা কেউ নৈরাজ্যবাদী নন। তাঁরা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা মানেন, যদি সেটা হয় তাঁদের স্বরাষ্ট্র। তার চারটি স্তম্ভের আবশ্যকতায় বিশ্বাস করেন, যদি সেগুলি হয় তাঁদের নিজেদের সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারা পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের উপরেও বিরূপ নন, কলকাতা কর্পোরেশনের মতো একটি মধুচক্র পেলে আনন্দে করেন পান সুধা নিরবধি। তাঁরা যে নীতিগতভাবে সত্য তথা অহিংসায় বিশ্বাস করেন তা নয়, তবে পলিসি হিসাবে মানেন। সেটাও যতদিন না ব্রিটিশ রাজের পরিত্যক্ত আসনে বসেছেন।

যাই হোক, আমার দৃষ্টি ছিল সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে স্বরাজ্যবাদের উপরে, তারই আনুষঙ্গিক ছিল ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেণ্ট, স্বদেশী সরকারের জবাবদিহি যার সদস্যদের কাছে। পঞ্চায়েতের কাছে ভারত সরকারের জবাবদিহি আমার মতে একটা রিমোট কনট্রোলের ব্যাপার। তার নজীর ভারতের ইতিহাসে বা অন্য কোনো দেশের ইতিহাসে নেই। থাকতে পারে প্রাচীন গ্রীকদের অ্যাথেন্স নগরে। সেখানে দাসপ্রথা ছিল, দাসদের ভোট ছিল না। ভোট দেবার অধিকার যে কত বড়ো একটা অধিকার গান্ধীজীও সেটা ক্রমে উপলব্ধি করেন। কংগ্রেসকে বলেন পার্লামেণ্টারি সাব কমিটি করতে, আসনের জন্যে লড়তে, সফল হলে মন্ত্রিত্ব নিতে। প্রাদেশিক সরকারের পরে যখন কেন্দ্রীয় সরকার হাতে আসে তখন সৈন্যদের হাতছাড়া করতে কেউ চান না। গান্ধীজীও

অনুমতি দেন।

কলেজে পড়ার পর আমি স্বাধীন সাংবাদিক হতেই চেয়েছি, রাষ্ট্রের কোনো একটা স্তম্ভের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাইনি। টলস্টয় হননি। রবীন্দ্রনাথ হননি। পার্লামেন্টে যাবার অভিলাষও আমার ছিল না। তবে আমি তার উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলুম না। ব্রিটেনে তার বিবর্তন আমার প্রিয় পাঠ্য ছিল।

সর্বশক্তিমান রাজাদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্যেই প্রজাদের দ্বারা পার্লামেন্টের প্রবর্তন। রাজায়-প্রজায় যুদ্ধক্ষেত্রে বল পরীক্ষার পর বরাবরের মতো স্থির হয়ে যায় যে, রাজাই থাকবেন রাষ্ট্রের শীর্ষে, কিন্তু তাঁর মন্ত্রীরা হবেন প্রজা-প্রতিনিধি। পার্লামেন্টের ভোটে তাঁদের বরখাস্ত করতে পারা যাবে। একটু একটু করে বোঝা গেল যে প্রজাপ্রতিনিধি যাঁদের বলা হচ্ছে তাঁরা নিম্নশ্রেণীর দ্বারা নির্বাচিত নন, কারণ নিম্নশ্রেণীর ভোট দেবার অধিকার নেই। সেটা উচ্চ শ্রেণীর কুক্ষিগত। বিস্তর আন্দোলনের পর ভোট অধিকার সম্প্রসারিত হতে হতে সাবালকমাত্রেরই উপর বর্তায়। কিন্তু সাবালিকামাত্রেরই উপর নয়। আমি যে সময় বিলেত যাই সে সময় অর্থাৎ ১৯২৭ সালে সাবালিকাদেরও ভোট দানের অধিকার দেওয়া হয়। রক্ষণশীল দলের আশা নতুন ভোটারেরা কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে তাঁদেরকেই ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেবেন।

ইতিমধ্যে এক দফা সাধারণ ধর্মঘট হয়ে গেছে। আমরা যাকে বলি 'বন্‌ধ'। শ্রমিকরা কাজ করবে না তো কী হয়েছে? মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরাই ট্রাম বাস কলকারখানা চালায়। কিছুই বন্ধ থাকে না। সাধারণ ধর্মঘট ব্যর্থ হয়। শ্রমিকরা যদি লড়তে চায় পার্লামেন্টের আঙিনায় এসে লড়ুক। ব্যালট দিয়ে লড়তে কে বাধা দিচ্ছে? ভোটের অধিকার তো পেয়েছে। কিন্তু পার্লামেন্টের বাইরে কোনো রণাঙ্গনে লড়তে গেলে বাধা দেওয়া হবে। মধ্যবিত্তরাই দেবে।

এক প্রবীণ ভদ্রলোক আমাদের বলেন, "আমরা এদেশের মধ্যবিত্তরা এ দেশে শ্রেণীযুদ্ধ ঘটতে দেব না। আমরাই দু'পক্ষকে সংযত করব। কোনো পক্ষের বাড়াবাড়ি সহ্য করব না।" তাঁর দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি বিরাট। ইতিমধ্যে লর্ড সভার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কমনস সভার হাতে সঁপে দিয়েছে। লর্ড কার্জনকেও প্রধানমন্ত্রী হতে দেয়নি। সে পদটা আগেকার দিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লর্ডদের একচেটে ছিল। আর লর্ডদের আড্ডা কার্লটন ক্লাব ছিল সরকারের পলিসি নির্ধারক।

আমি বিলেতে থাকতেই শ্রমিকদল সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন

করেন। প্রধানমন্ত্রী হন র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। এক কৃষককন্যার পিতৃ পরিচয় হীন সন্তান। ইংলণ্ডের নীল রক্ত লাল হয়ে যায়। সকলে বুঝতে পারে যে একটা রক্তপাতশূন্য বিপ্লব ঘটে গেছে। শ্রমিকদের হারিয়ে দিতে হলে ভোটের জোরে হারিয়ে দিতে হবে। গায়ের জোরে নয়। শেষপর্যন্ত তাই হয়। আমার চলে আসার পরে রক্ষণশীলরা আবার প্রবল হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আবার শ্রমিকদল গদী ফিরে পায়। এবার রাষ্ট্রের চরিত্রটাই বদলে দেয়। রাষ্ট্র হয় 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'। প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষাদীক্ষা, কাজকর্ম, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতির দায় বহন করে রাষ্ট্র। অথচ পার্লামেণ্টকে খর্ব করে বা ধ্বংস করে নয়। পার্লামেণ্টের দ্বারা আইন পাশ করিয়ে নিয়ে। এইখানে কমিউনিজমের সঙ্গে সোসিয়ালিজমের তফাৎ।

কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরকে পাবলিক সেক্টরে পরিণত করার ফল যা দাঁড়ায় তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর মনে হয়। তাই দেশের লোক শ্রমিক দলকে ভোটে হারিয়ে দেয়। কাজ দেখাও, নয়তো হট যাও। কাজের দ্বারাই সরকারের বিচার হয়। প্রতিশ্রুতির দ্বারা নয়। গড়পড়তা ইংরেজ সোসিয়ালিস্টও নয়। বুর্জোয়াও নয়, বুর্জোয়াবিরোধীও নয়। লর্ডের ছেলেরাও স্বেচ্ছায় লর্ড পদবী ত্যাগ করে কমনার হয় ও কমন্স সভায় নির্বাচিত হয়। টোনি বেন তো কট্টর বামপন্থী। শ্রমিকদের চেয়েও লাল। অথচ সামাজিক অর্থে শ্রেণীশত্রু। ওই পার্লামেণ্ট থাকার দরুন এখন পর্যন্ত ইংলণ্ডে শ্রেণীসংগ্রাম হয়নি, নিকট ভবিষ্যতে হবেও না। প্রত্যেকদিনই শ্রমিক বংশের ছেলেরা মধ্যবিত্ত বনে যাচ্ছে। মুদির মেয়ে মার্গারেট থ্যাচার রীতিমতো রক্ষণশীল।

মুদির কন্যা যেমন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন রক্ষণশীল দলের, শ্রমিক কন্যা তেমনি লেডী হয়ে লর্ড সভায় স্থান পেয়েছেন। আমি যখন বিলেতে ছিলুম জেনী লী তখন শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে পার্লামেণ্টের নির্বাচনে জেতেন। অ্যাংরি ইয়াং উওম্যান। জ্বলন্ত আগুন। পরে অ্যানিউরিন বেভানের সঙ্গে এর বিবাহ হয়, ইনি নিজের পদবীই রাখেন। বেভানের মৃত্যুর পর ইনি একবার শান্তিনিকেতনে আসেন। আমার সঙ্গে আলাপ হয়। পার্টি তখন ক্ষমতাসীন। ইনি ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এমারজেন্সীর সময় আবার ইনি ভারতভ্রমণে আসেন। আবার এঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে সাক্ষাৎ। এবার ইনি লেডী লী, লর্ড সভার মেম্বর। একজন আই. এ. এস মহিলাকে এঁর গাইড করে দিল্লী থেকে পাঠানো হয়েছে। জিজ্ঞাসার উত্তরে লেডী লী বলেন "আমরা স্থির করেছি লর্ড

সভাটাই উচ্ছেদ করব।" গাছের ডালে বসে গাছের মূল উচ্ছেদ করা এখনো সম্ভব হয়নি। কারণ তাঁর দেশের লোকগুলোই রক্ষণশীল। তারা শ্রমিককে লর্ড করবে, লর্ডকে শ্রমিক করবে, কিন্তু শোভাবর্ধনের জন্যে যেমন রাজা ও রানীকে রাখবে তেমনি লর্ড ও লেডীকে রাখবে।

বার্নাড শ কিংবা ওয়েব দম্পতী পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর মোহে মুগ্ধ ছিলেন না। সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁদের মতে শোভাবর্ধন। আমূল সামাজিক পরিবর্তন কোনো পার্লামেণ্টের মাধ্যমে হবে না। সত্যিকারের ক্ষমতা থেকে যাবে আর্মি, পুলিশ, সিভিল সার্ভিস, আদালত ইত্যাদির হাতেই আর সেগুলির ভিতরে জাঁকিয়ে বসে থাকবেন ইটন, হ্যারো, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের পুত্রগণ। এঁদের শ্রেণীস্বার্থ বিপন্ন করে এঁরা কখনো আমূল পরিবর্তনে রাজী হবেন না। পঞ্চাশ বছর পরেও দেখা যাচ্ছে চারটি স্তম্ভই শ্রমিক শ্রেণীর নাগালের বাইরে। তবে তাঁদের পুত্রকন্যারা একটু সুফল দেখালেই উচ্চ শিক্ষায়তনগুলিতেই স্কলারশিপ পেয়ে ভর্তি হচ্ছে, সমান সুযোগ পাচ্ছে। এক একটা কলেজের শতকরা আশিজন ছাত্রছাত্রীই স্কলারশিপ ভোগী। তারপরে দুর্গের ভিতরে ঢুকতে না পারুক পাবলিক সেক্টর বা প্রাইভেট সেক্টরে কাজকর্ম পায়। জেনী লীর মতো তাদেরও জ্বলন্ত আগুন নিবন্ত হয়ে যায়। যে সীস্টেম তাদের নিখরচায় শিক্ষা দিচ্ছে ও সহজে জীবিকা দিচ্ছে তাকে উচ্ছেদ করা তাদের মুখে শোনা গেলেও কাজের বেলা গতানুগতিকের উনিশ বিশ। কয়লাখনির শ্রমিকরাই এখন ইংলণ্ডের ধনিকশ্রেণীর সংগ্রামী প্রতিপক্ষ। মধ্যবিত্তদেরও। পার্লামেণ্টের বাইরে লড়তে লড়তে ওরা এখন শ্রান্ত ক্লান্ত পরাস্ত। কিন্তু এখনো বহ্নিমান।

এবার আমার নিজের কথা বলি। বিলেতের হোম সিভিল সার্ভিস বলতে যা বোঝায় ভারতের ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বলতে তা নয়। সফল প্রতিযোগীরা সকলেই চাকরিতে যোগ দেয় ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে, কিছুকাল মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হয়, তারপরে কেউ হয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ জেলা জজ। পরে তাদের থেকে বেছে বেছে সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী ইত্যাদি করা হয়। আমিও যথারীতি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হই, তার পরে কখনো ম্যাজিস্ট্রেট, কখনো জেলা জজ, শেষে মাস ছয়েকের জন্যে জুডিসিয়াল্ সেক্রেটারী হয়ে চাকরি থেকে অকালে অবসর নিই। তখন আমার বয়স সাতচল্লিশ। মাত্র একুশ বছরের অভিজ্ঞতা।

প্রথম থেকেই আমি পর্যবেক্ষক। আমার পর্যবেক্ষণের বিষয় ভারতের মাটিতে

ইংলণ্ডের দ্বারা প্রবর্তিত সীস্টেম ছাড়া আর কোনো সীস্টেম কার্যকর হতে পারে কিনা। কার্যকর হলে সেই সীস্টেম কী। কোথাও তার কোনো নজীর আছে কিনা। ইংরেজদের আসার হাজার হাজার বছর আগেই ভারতে রাজতন্ত্র ছিল। রাজাই ছিলেন চূড়ান্ত প্রশাসক ও চূড়ান্ত বিচারক। ইংলণ্ডের রাজারাও তাই। তফাৎ যেটা সেটা প্রজাদের পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে। ইংরেজরা এ দেশে পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠা করতে না দেওয়ায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেটা সাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান নয়। কংগ্রেস তাই আইন সভার নির্বাচনের দাবী জানায়। আন্দোলনের ফলে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয়, কিন্তু ধর্ম ভেদে নির্বাচন কেন্দ্রভেদ। এটা ব্রিটিশ সীস্টেম নয়।

রাষ্ট্রের চারটি স্তম্ভ আগে থেকেই অল্পবিস্তর ছিল। ইংরেজরা মোগল ও মারাঠা সীস্টেমকে যথাসম্ভব বহাল রাখে, প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে, কিন্তু পুরোপুরি ব্রিটিশ সীস্টেমে রূপান্তরিত করে না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যিনি তিনিই কলেক্টর। অর্থাৎ রেভিনিউ কলেক্টর। চিরকাল রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম ছিল এক হাতে রাজস্ব আদায়, আরেক হাতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা। ইংলণ্ডের ম্যাজিস্ট্রেটরা কেউ কলেক্টর নন। এটা ব্রিটিশ ভারতীয় ব্যবস্থা। মোগলদের সময় এরকম ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমলের গোড়ার দিকেও যিনি কলেক্টর তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন না। যিনি জজ তিনিই ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। নানা কারণে কলেক্টরকে করা হয় ম্যাজিস্ট্রেট তথা কলেক্টর। আর জজকে সিভিল তথা সেসনস জজ। সিভিলটা এদেশেও ছিল। সেসনসটা বিলেত থেকে আমদানি।

আমার কার্যকালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নতুন একটা ভার দেওয়া হয়। জেলার ডেভলপমেণ্ট বা বিকাশের ভার। সেই ভারটাই ক্রমশ ভারী হয়ে উঠেছে। অন্যান্য ভার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর মামলা বিচার করেন না, মামলার আপীল শোনেন না। তেমনি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটও আর মামলা বিচার করেন না। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বলে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু শান্তিভঙ্গ নিবারণের জন্য আদেশ জারির ক্ষমতা যাদের হাতে ছিল তাদের হাতেই রয়েছে।

চাকরিতে ঢুকে দেখি ইউনিয়ন বোর্ড আমার আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের তৈরি আইন অনুসারে। তিনি তখন বাংলার লাটের শাসন পরিষদের সদস্য। তখনো লর্ড হননি। গ্রাম পঞ্চায়েৎ আগে থেকেই

ছিল। কয়েকখানা গ্রাম মিশিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড। বোর্ডের কাজকর্ম সন্তোষজনক হলে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় বেঞ্চ আর কোর্ট। একটা ফৌজদারি আদালত, অন্যটা দেওয়ানি আদালত। মহকুমা শাসক ও জেলা শাসক রূপে আমি এদের কাজকর্ম দেখি। মিউনিসিপালিটিগুলো আরো আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত। তাদের কোনো স্বদেশী প্রতিরূপ ছিল না। ইউনিয়ন বোর্ডগুলির ছিল।

নৈরাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি পর্যবেক্ষণ করে আমি সর্বত্র লক্ষ্য করি, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তথা মেম্বররা কর ধার্য করতে একেবারেই ইচ্ছুক নন, সার্কল অফিসারদের চাপে যতটা পারেন করেন। সকলেরই অভিলাষ হাকিম হয়ে আসামীকে জরিমানা করবেন বা জেলে দেবেন। চৌকিদারদের খাটিয়ে নেবেন। তারপর মুনসেফ হয়ে দেওয়ানি মামলায় ডিক্রী দেবেন। ডিক্রী জারি করবেন। আমরা এদের কাছে ডেভেলপমেন্টের কাজ প্রত্যাশা করে তেমন সাড়া পাইনি। কারণ তাতে টাকা খরচ হতো, সে টাকা তুলতে হতো কর বাড়িয়ে। এ সমস্যার সমাধান হয়েছে বর্তমান সরকারের বিপুল অনুদানে। এটা কিন্তু পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থাকে দৃঢ়মূল করা নয়। কার্যত এজেন্সীতে রূপান্তরিত করা। এটা রাষ্ট্রকেই দৃঢ়মূল করা। রাষ্ট্র কোনোদিন শুকিয়ে যাবে না।

রাষ্ট্র থাকবে, কিন্তু রাজতন্ত্র থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। যেখানে থাকবে সেখানে ইংলণ্ডের মতো থাকলে ভালো হয়। সেখানে রাজার মতো জনপ্রিয় মানুষ দ্বিতীয় কেউ নেই। কিন্তু তিনি শুধু জনপ্রিয়, শক্তিমান নন। শক্তিমান হলে জনপ্রিয় হতেন না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তাঁর চেয়েও শক্তিমান, কিন্তু তাঁর মতো জনপ্রিয় নন। স্বাধীনতা পেলে আমরা কি ইংরেজদের অনুকরণ করব, না আমেরিকানদের? কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠা করেছি তখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টই হবেন দেশের প্রেসিডেন্ট। এরকম একটা কল্পনা গান্ধীজীর মনেও ছিল। মুসলিম লীগ প্রতিদ্বন্দ্বী না হলে সেইরকম কিছু হতো। তবে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের মিল যত ছিল অমিল ছিল তার চেয়ে বেশী। সেখানকার শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতাকে তিন সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কংগ্রেসের এক ভাগ, সুপ্রীম কোর্টের এক ভাগ, প্রেসিডেন্টের এক ভাগ। তাছাড়া সে দেশের অঙ্গরাজ্যগুলিও স্বয়ংশাসিত, তাদের গভর্নররা নির্বাচিত। উপর থেকে মনোনীত নন। রাজতন্ত্র বহুদেশ থেকে উঠে গেছে, রাজার স্থান নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট, কিন্তু আর কোথাও আমেরিকার মতো কংগ্রেস বা সুপ্রীম কোর্ট দেখা যায়নি। তেমন শাসনব্যবস্থা এদেশে কি চলবে?

গান্ধীজী পরে এর বিচিত্র সমাধান করেন। আটটি প্রদেশের শাসনভার যখন কংগ্রেসের উপর বর্তায় তখন তাদের মাথার উপরে আসেন ওয়ার্কিং কমিটির তিনজন জ্যেষ্ঠ সদস্য। এরা নেপথ্যচারী। কারো কাছে এদের জবাবদিহি নেই। জবাবদিহি বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীর। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টও এঁদের কাছে জবাবদিহি চাইতে পারেন না। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নন, ইংলণ্ডের রাজা। জনপ্রিয়, কিন্তু শক্তিমান নন। জবাহরলালের এতে আপত্তি ছিল না, সুভাষচন্দ্রের ছিল। এই নিয়ে তাঁর দ্বিতীয়বারের নির্বাচনের সময় আভ্যন্তরীণ বিবাদ। প্রেসিডেন্ট বনাম হাই কমাণ্ড। অন্তরালে গান্ধী। গান্ধী বনাম সুভাষ। অন্তরালে হিংসা বনাম অহিংসা। পরবর্তীকালে দেখা গেল কংগ্রেস হাই কমাণ্ড বনাম মুসলিম লীগ হাই কমাণ্ড। গান্ধী বনাম জিন্না। অখণ্ড ভারত বনাম দ্বিখণ্ড ভারত। দেশ ভাগ হয়ে গেল। তখন দেখা গেল ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে গভর্নমেণ্ট ও পার্টি একাকার হয়ে গেছে। গভর্নমেণ্টে যাঁরা পার্টিতে তাঁরাই কর্তা। যাঁরা এখানে তাঁরাই ওখানে। সোভিয়েট ইউনিয়ন আর ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে তফাৎ কোথায়? সংবিধান রচনার সময় প্রধানত ব্রিটেনকেই অনুসরণ করা গেল। তার সংবিধানটি অলিখিত। আমাদেরটা লিখিত। কিন্তু এর একটা অলিখিত অংশও আছে। সেটা এই যে প্রধানমন্ত্রীই কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন করবেন। প্রক্সিতে পার্টি অর্গানাইজেশন চালাবেন। উপযুক্ত পাত্র না পেলে নিজেই কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হবেন। আমরাও দেখেছি যে এর কোনো কার্যকর বিকল্প নেই। কংগ্রেস সরকারের পর জনতা সরকার এসে নিজেদের প্যাঁচে নিজেরাই কাৎ হলেন।

যাই হোক, আমার অনুসন্ধান ব্রিটিশ আমল নিয়ে। সেইখানে ফিরে যাই। শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ দুটোতেই আমার হাতে-কলমে শিক্ষা। প্রবণতাটা ছিল শাসন বিভাগের দিকে, সরকারের ইচ্ছা অন্যরূপ। তাতে আমার শাপে বর হয়েছিল। নইলে 'সত্যাসত্য' কোনোদিনই সমাপ্ত হতো না। অসময়ে মারা গেলে অসমাপ্ত উপন্যাস রেখে যেতুম। আমার অনুসন্ধানের ফল এই যে জজদের স্বাধীনতা খর্ব করা চলবে না, লোকে চায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার। তার দরুণ বেধে যায় পুলিশের সঙ্গে বিরোধ। পুলিশকে বোঝানো মুশকিল যে ব্রিটিশ জাস্টিসের উপর আস্থা না থাকলে ব্রিটিশ রাজত্ব এত দীর্ঘস্থায়ী হতো না। হাইকোর্টের উপর লোকের ছিল অপরিসীম ভক্তি। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবেও আমাকে পুলিশের কুনজরে পড়তে হয়। ব্রিটিশরাজ যদি পুলিশরাজ হতো তা হলে আরো আগে ভেঙে পড়ত।

পুলিশ না হলে কি চলে না? না, চলে না। পুলিশের কাজ আমি নিজে করতে গিয়ে নাজেহাল হয়েছি। এক নারীধর্ষকের বাড়ীতে বিনা নোটিসে হাজির হয়ে দেখি আসামী উধাও। আমাকে সেই বর্ষার দিনে পায়ে হেঁটে, নৌকোয় চড়ে, ট্রেন ধরতে না পেয়ে রেললাইনের ধার দিয়ে হেঁটে, পুলের উপর পাতা স্লিপারের উপর অন্ধকারে লাফাতে লাফাতে রাত আড়াইটের সময় টমটমে চড়ে অভুক্ত অবস্থায় বাসায় ফিরতে হয়। কাউকে জানতে দিইনে কোথায় গেছলুম, কেন গেছলুম। পুলিশকে তো নয়ই। ম্যাজিস্ট্রেটরা সব পারেন, কিন্তু সঙ্গে পুলিশ না থাকলে তাঁদের নিজেদেরই বিপদ। ভাগ্যিস, আমি মুসলমানের হারেমে ঢুকিনি, নইলে আমার বিরুদ্ধেই নালিশ দায়ের হতো। বলে রাখি, ধর্ষিতা নারীটিও মুসলমান। করুণ কাহিনী। ওটা ছিল একটা র‍্যাকেট। ধর্ষিতাকে পরে চালান দেওয়া হতো পাঞ্জাবে বিক্রীর জন্যে। এখনো হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে।

পুলিশ থাকবে, কিন্তু মাথায় চড়ে বসবে না। পুলিশকে আয়ত্তের মধ্যে রাখবেন ম্যাজিস্ট্রেট। সেইজন্যে ম্যাজিস্ট্রেটকে হতে হবে স্ট্রং। তাঁকে দুর্বল করার মতো ভুল আর নেই। মন্ত্রী মহারাজদের এটা বোঝানো যাবে না। ইংলণ্ডে তাদের কাজ হচ্ছে পলিসি নির্দেশ করা। পলিসিকে কাজে পরিণত করার ভার তাঁদের উপর নয়। এদেশে তাঁরা নিজেরাই সেটা করবেন, কিন্তু নিমিত্তরূপে ব্যবহার করবেন সব্যসাচীকে। এতে সব্যসাচীর মান থাকে না, ইজ্জৎ থাকে না, গোলমাল বাধলে তাকেই জবাবদিহি করতে হয়, বিপাকে পড়তে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট না হলে কি চলে না! না, চলে না। যেমন আমাদের দেশ, এখানে ম্যাজিস্ট্রেট না হলে শাসনকার্য অচল হবে। অথচ তাঁকে আজ্ঞাবহ দাস করলেও একই অচল অবস্থা। ম্যান অন দ্য স্পটকে ফ্রী হ্যাণ্ড দিতে হবে, যেমন ব্রিটিশ আমলে। কথায় কথায় বদলী করে তাঁর মেরুদণ্ড ভাঙলে রাষ্ট্রেরই ক্ষতি।

ম্যাজিস্ট্রেটও স্বৈরাচারী হতে পারেন। তাঁকে সংযত রাখার জন্যে থাকবেন জজ। জজ না হলে কি চলে না? চলে না যে তার প্রমাণ গুলী বর্ষণ ইত্যাদির পর লোকে চায় জুডিসিয়াল এনকোয়ারি। অন্য প্রকার এনকোয়ারিতে লোকের অনাস্থা। সুখের বিষয় জজদের ন্যায়বিচারের উপর এখনো লোকের শেষ ভরসা। যে দেশে ন্যায়ধর্ম নেই সেদেশে হিন্দুধর্ম বা ইসলাম ধর্ম থাকলেও লোকে নিরাপদ বোধ করে না। সেটা দেশীয় রাজ্যে আমি দেখেছি। সেখানেই আমার জন্ম ও বাল্যকাল। ব্রিটিশ জাস্টিসের মতো আর কিছু এদেশে তার আগে ছিল না, তাই

সেটা এত দীর্ঘস্থায়ী হলো। এখন ইণ্ডিয়ান জাস্টিস কি হবে দেশীয় রাজ্যের মতো, না ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার মতো? সম্ভব হলে তার চেয়েও ভালো? ম্যাজিস্ট্রেটরা যেমন হবেন স্ট্রং, জজরা হবেন জাস্ট। আর পুলিশ হবে সজাগ।

আর্মি ঠিকই আছে, তা নিয়ে আমার বলার কিছু নেই। সেখানে জাতি বর্ণের বালাই নেই, অহিন্দুরাও সমান সুযোগ পাচ্ছেন। তবে কথায় কথায় আর্মিকে ডেকে পুলিশের কাজ করিয়ে নিলে যুদ্ধের দিন কাকে ডাকা হবে? পুলিশকে? কর্মবিভাগ মানতে হবে। যার কর্ম তাকে সাজে। পুলিশকে আরো মজবুত করো। আর্মিকে ডাকলে ম্যাজিস্ট্রেটরা তাকে কন্‌ট্রোল করতে পারবেন না। সেইজন্যে আমাদের সতর্ক করা হয়েছিল পারতপক্ষে আর্মিকে না ডাকতে। মিলিটারি যদি সিভিলের কাছে দায়ী না হয় তবে মিলিটারি শাসনের পথ প্রশস্ত হয়। শেষে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মতো অবস্থা হবে। মিলিটারি যদি সওয়ার হয় তাকে পিঠ থেকে নামানো যাবে না। জনসাধারণকেও এটা বুঝতে হবে। সময় থাকতে সংযত হতে হবে। এত উচ্ছৃঙ্খলতা কেন? এ যে মাৎস্যন্যায়ের পদধ্বনি।

১৯৮৫

ছড়া লেখা

ছড়া লেখা কথাটা ঠিক নয়। হওয়া উচিত ছড়া কাটা। ছড়া কাটতে হয় মুখে মুখে। কলমের মুখে নয়। ঠাকুমা দিদিমারা এখনো মুখে মুখে ছড়া কাটেন। পুরনো ছড়া নয়, নতুন ছড়া। তাঁদেরই বানানো।

আমাদের দেশে—আমাদের দেশে কেন, সব দেশে দেশেই প্রথমে ছিল একটা মৌখিক ঐতিহ্য। ওরাল ট্রাডিশন। তার পরে এল লৈখিক ঐতিহ্য। রাইটিং ট্রাডিশন। ছড়া, বচন, ধাঁধা, হেঁয়ালি প্রভৃতি লোকের মুখে মুখে গজিয়ে উঠত। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত। পুরুষানুক্রমে! যুগ যুগ ধরে! সেসব সৃষ্টি কাগজে কলমে ধরে রাখার চেষ্টা করা হতো না। তাই অধিকাংশই বুদ্বুদের মতো উঠে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যেত।

সংগ্রহ করে রাখার উদ্যম শুরু হয় পশ্চিমেই। ছাপার অক্ষরে। ক্রমশ প্রচার বাড়ে। যে ছড়া নিতান্ত সাময়িক সেটা সময়ের বেড়া পেরিয়ে যায়। যে ছড়া একান্ত স্থানীয় সে ছড়া স্থানের সীমানা উত্তীর্ণ হয়। উপভাষায় রচিত ছড়া সর্বসাধারণের সহজবোধ্য হতে গিয়ে স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষার ছাঁচে ঢালাই হয়। পশ্চিমের মতো এদেশেও সেইরকম ঘটে। গবেষক ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেন না 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে'র আদি রূপ কী ছিল, তার উৎপত্তি কোথায়, তার সঙ্গে আর কিছু জুড়ে দেওয়া হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে সেটা কবে আর কোথায়? আমরা যে আকারে পাই সেই আকারটা নিশ্চয়ই কয়েক শতকের বিবর্তনের ফল। লিখিত ও মুদ্রিত হলে বিবর্তনের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মৌখিক ঐতিহ্য যেখানে বিবর্তন সেখানে মুখে মুখে হয়।

আমরা যদি মনে রাখি যে ছড়ার ঐতিহ্য হাজার হাজার বছরের মৌখিক

ঐতিহ্য তা হলে আমরাও সেই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে ছড়া কাটব বা লিখব। যাঁরা লিখতে চান তাঁরা ঢাকার বা চট্টগ্রামের উপভাষাতেও লিখতে পারেন। পরে সেটাকে স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষার আদলে আনা যাবে। ছড়া হওয়া চাই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। তার প্রধান শত্রু হচ্ছে কৃত্রিমতা ও চাতুরী। চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না, বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। চালাকির দ্বারা খাঁটি ছড়াও হয় না।

খাঁটি ছড়া কলমের মুখে ফুটলেও তার ধরনটা হবে অশিক্ষিত মানুষের মুখে ফোটা ছড়ার মতো। দেশের মৌখিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশ খাবে। সহজেই মুখস্থ হয়ে যাবে। সহজেই মুখে মুখে ঘুরবে। লোকে একদিন ভুলে যাবে কে লিখেছেন। যেমন ভুলে গেছে 'আগডুম বাগডুম' কার মুখ থেকে নিঃসৃত।

লোকসাহিত্য যাকে বলা হয় তার মূলে এক একজন ব্যক্তিই! দশজনে মিলে একটা ছড়া বা কাহিনী বানায় না বা শোনায় না। তবে দশজনে মিলে কিছু কিছু জুড়ে দেয়। সেটা লিখিত ছড়া বা কাহিনীর বেলা চলে না। সেক্ষেত্রে লেখক কে তা স্পষ্ট। লেখকই তার গুণাগুণের জন্যে দায়ী। পদাবলীকাররা সযত্নে নিজ নিজ নাম সন্নিবিষ্ট করতেন। চিনতে ভুল হয় না কোন্ পদটা বিদ্যাপতির, কোন্টা চণ্ডিদাসের, জ্ঞানদাসেরই বা কোন্টা। পদাবলীর পদ কখনো দু'লাইনের বা চার লাইনের হয় না। ছয় লাইন বা আট লাইনেরও না। অপরপক্ষে ছড়া, বচন, ধাঁধা ইত্যাদি মনে রাখবার মতো সংক্ষিপ্ত।

শিক্ষিত ভদ্রলোকরা কখনো ছড়া জাতীয় রচনায় হাত দিয়েছেন বলে শোনা যেত না। এটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রয়াস। তবে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যেও আমরা এ জাতীয় পঙক্তি পাই। 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'। অনায়াসে মৌখিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশ খেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথই আমাকে ছড়া লিখতে বলেন। তাঁর নিজের লেখা একখানা বইও পাঠিয়ে দেন! "সে।" তাতে তাঁর স্বরচিত ছড়াও ছিল। একজন মহাকবির পাকা হাতের লেখা। অশিক্ষিত পটুত্বের কণামাত্র নিদর্শন নেই। চতুর, কৌশলী রচনা। পদে পদে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য। বাগ্‌বিভূতি। নিটোল নিপুণ পদ্য বলতে পারি, কিন্তু ছড়া? আমার ছড়ার ধারণার সঙ্গে মেলে না। রবীন্দ্রনাথ যা-ই লেখেন তা সাহিত্য হয়। কিন্তু লোকসাহিত্য? চাষী, তাঁতী, জেলে, জোলার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ার মতো রসাত্মক বাক্য? না বোধ হয়।

গুরুদেবকে বলি ছড়া আমার হাত দিয়ে হবে না। তার বছর পাঁচেক পরে হঠাৎ আমার ছড়ার হাত খুলে যায়। "করেছি পণ নেব না পণ বৌ যদি হয়

সুন্দরী।" তার পর আরো এগিয়ে যাই। আমার উদ্দেশ্য হয় এমন কিছু দেওয়া যেটা আমাকে যারা খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের অর্থাৎ চাষী, তাঁতী, জেলে, জোলা ইত্যাদির ঋণশোধ। তারা যদি গ্রহণ করে ও স্মরণ রাখে তা হলেই আমি কৃতার্থ। বলাবাহুল্য তাদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র ছিল না। আমার প্রকাশিত রচনা তাদের কাছে পৌঁছয় না। অধিকাংশই নিরক্ষর। ক্রমে ক্রমে আমার ছড়া শিশুদের প্রতি উদ্দিষ্ট হয়। পত্রিকার সম্পাদকদের দিক থেকে অনুরোধ আসে। আমিও লিখে কৌতুক পাই। চাষীর সঙ্গে চাষী না হই, শিশুর সঙ্গে শিশু তো হয়েছি।

এ শতাব্দীর চতুর্থ দশকটা ছিল যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, জাতীয় সংগ্রাম প্রভৃতির। আমার ছড়া সমসাময়িক ঘটনাবলীর খাতেও বয়। চারদিক থেকে তার জন্যে অনুরোধ আসে। ছড়াই হয়ে ওঠে আমার রাজনৈতিক ভাষ্য, যদিও আমি রাজনীতির বাইরের লোক। কৌতুক রসই আমার অবলম্বন। তার আড়ালে থাকে নিগূঢ় মর্মবেদনা। সে বেদনার শরিক সকলেই। "তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো" তেমনি এক বেদনার সকৌতুক প্রকাশ। যেখানেই যাই এটি শুনতে পাই। কাল সন্ধ্যায় একটি অনুষ্ঠানে শুনে এলুম। বাংলাদেশে গিয়েও শুনেছি।

ছড়া লিখতে বসলেই লেখা যায় না। তার জন্যে মন মেজাজ অনুকূল হওয়া চাই। ইংরেজীতে যাকে বলে মুড, আমি তাঁর অপেক্ষায় থাকি। একটা কি দুটো লাইন আপনা থেকে আসে। তা না হলে ছড়া সুগম হয় না। এক একটা সুরও এক এক সময় আমাকে তার উপযুক্ত বাক্যের সন্ধানী করে। কথা আগে না সুর আগে? কখনো কথা আগে, কখনো সুর আগে। ছড়াকে লোকে ছড়া গানও বলে। ছড়াকে গান হিসাবেও গাওয়া যায়। আমার কোনো কোনো ছড়া গান হিসাবে গ্রামোফোন রেকর্ডে ঠাঁই পেয়েছে। সুর কিন্তু আমার দেওয়া নয়।

ছড়ায় হাত দেওয়ার আরো একটা কারণ ছিল। আমি আগেকার দিনে কবিতাই লিখতুম। কিন্তু ছন্দ ও মিল বজায় রাখাই অভ্যাস। যাঁরা গদ্যকবিতা লেখেন আমি তাঁদের একজন নই। আমি পুরাতন ঐতিহ্য অনুসরণ করি। কিন্তু পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন ভাষা খাপ খায় না। আর পুরাতন ভাষা আমার পছন্দ হয় না। গদ্যে আমি সাধুভাষার পক্ষপাতী নই। পদ্যেই বা হই কী করে? কবিতা কিছুতেই মনের মতো হচ্ছে না দেখে আমি কবিতা লেখা মুলতুবি রাখি। আগে ভাষাটাকে তার উপযোগী করি, তার পরে আবার লিখব। ইতিমধ্যে ছড়া

লিখে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। ঘোলও যথেষ্ট স্বাদু। গ্রীষ্মকালে ঘোলের সরবৎ কে না ভালোবাসে? দুধও থাকবে, ঘোলও থাকবে, উভয়ের সমজদারও থাকবে। টক টক মিষ্টি মিষ্টি ঘোল কারো কারো কাছে আরো মুখরোচক। আমার কবিতার পাঠকের চেয়ে ছড়ার পাঠকসংখ্যাই বেশী।

কবিতার মতো ছড়া লেখাও একটা সাধনা। মহাকবিরাও শব্দের মায়ায় পড়ে মায়ামৃগের পেছনে ছোটেন। সীতাকে ভুলে যান। ছোট ছোট ছড়াকাররা কিন্তু তেমন নন! 'খুকুমণির ছড়া' আমার আদর্শ। শব্দ ছড়াকারদের কাছে মুখ্য নয়। তাঁরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। অনেকেই মেয়েমানুষ। সহজে যা মুখে আসে সহজে যা মনে থাকে, সেই সামান্য পুঁজি নিয়ে তাঁদের কারবার। জীবনে হয়তো একটা কি দুটো ছড়া কেটেছেন। কবির লড়াইয়ের মতো ছড়ার লড়াইও হয়তো চলত। কথা কাটাকাটির মতো ছড়া কাটাকাটি। তার থেকে কিছু টিঁকে আছে। আর সব হারিয়ে গেছে।

সত্যি বলতে কী, ছড়ার রাজ্য আমাদের মতো লেখকদের রাজ্য নয়। সেটা তাদেরই রাজ্য যারা হাজার হাজার বছর ধরে ছড়া কেটে এসেছে। লেখাপড়ার ধার ধারেনি। যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষায় ছড়া কাটে। খুব একটা ভেবে-চিন্তে নয়। ক্ষণিক আবেগে বা উত্তেজনায় বা হাস্যকৌতুকে। সেই ক্ষণটাই যদি সর্বকালের জন্যে বা দীর্ঘকালের জন্যে অক্ষয় হয়ে থাকে তবে সেটা তাঁদের গণনার বাইরে। অমর যে কেবল মহাকবিরাই হন তা নয়, নামহীন গোত্রহীন ছড়াকাররাও হন। ইংরেজী কবিতার সংকলনে শেক্সপীয়ার, মিলটনের পাশাপাশি 'অজ্ঞাতনামা'দেরও স্থান আছে। ছড়া যে কত বিচিত্র হতে পারে তা ইংরেজী কাব্যসংকলন পড়লে জানা যায়। দুঃখের বিষয় 'খুকুমণির ছড়া'র পর তেমন কোনো সংগ্রহপুস্তক আর হয়নি বা হয়ে থাকলে আমার নজরে পড়েনি। তবে বিভিন্ন গবেষকের বিভিন্ন গ্রন্থে ছিটানো ছড়ানো বিচিত্র ছড়া আমি লক্ষ করেছি। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের প্রকাশিত ছড়ার সংগ্রহ তেমন শ্রমসাধ্য নয়, কিন্তু গ্রামে গ্রামে প্রচলিত লোকমুখে উচ্চারিত বিভিন্ন প্রকার ছড়া বা ছড়া জাতীয় রচনার সংগ্রহ জীবনব্যাপী পরিশ্রমসাপেক্ষ। প্রদেশ ভাগ হয়ে যাবার পর একজনের নয়, একাধিক জনের। টেপ রেকর্ডারে সুরটা ধরে রাখা উচিত।

আমার কাছে যাঁরা ছড়া সম্পর্কীয় উপদেশ চাইতে আসেন আমি তাঁদের বলি 'খুকুমণির ছড়া'র রসে অবগাহন করতে। শব্দ জুড়ে জুড়ে ছড়া লেখা শিক্ষিত জনের পক্ষে তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু শিক্ষাভিমান ত্যাগ করে

প্রাকৃত ভাষায় প্রাকৃত জনের মৌখিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নেওয়া সাধনা-সাপেক্ষ কাজ। চতুর যিনি তিনি স্বেচ্ছায় চাতুরী পরিহার করেছেন এমন দৃষ্টান্ত খুব কম। ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ঐশ্বর্য বিসর্জন করেছেন এমন দৃষ্টান্তই বরং বেশী। বৈষ্ণব সাধকদের কাছে বিষয় যেন বিষ। বিভূতির দ্বারা তাঁরা বিভ্রান্ত হতে চান না। লোকসাহিত্যের ধারাবাহিকতার সঙ্গে যাঁরা নিজেদের রচনা যোগ করতে ইচ্ছা করেন তাঁদেরও সেইরকম একটা সাধনা বরণ করতে হবে। সাধনা অনুসারে সিদ্ধি। ছড়া একপ্রকার আর্টলেস আর্ট। শিশুরা সহজে পারে, বয়স্করা সহজে পারে না। মেয়েরা সহজে পারে, পুরুষেরা সহজে পারে না। অশিক্ষিতরা সহজে পারে, শিক্ষিতরা সহজে পারে না। মূর্খেতে বুঝিতে পারে, পণ্ডিতে লাগে ধন্দ।

পরিশেষে স্বীকার করি, আমার সব ছড়া, ছড়া হয়নি। 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।' তেমনি, যে লেখে বিস্তর ছড়া সে লেখে বিস্তর পদ্য। আমার নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। তাছাড়া পদ্য যেমন নিখুঁত হয়, ছড়া তেমন নিখুঁত হয় না। লোকমুখে নিখুঁত হয়নি ও হবে না। কোনো কোনো ছড়ায় আমি ইচ্ছা করে কিছু খুঁত রেখে দিয়েছি। অনেকরকম এক্সপেরিমেণ্টও করেছি। কতকটা বিলিতীর অনুসরণে। ছড়ার দেশ কাল নেই। দেশী বিলিতী অবান্তর।

১৯৮৪

ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে যেমন জীবনে একবার মক্কাশরিফে হজ্ করতে যেতে হয় তেমনি শিক্ষানুরাগী ভারতীয়কেও—বিশেষ করে বাঙালীকেও—জীবনে একবার লণ্ডনশরিফ বা প্যারিসশরিফে গিয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করতে হয়। এ না হলে তার জীবন বার্থ। তরুণ বয়সে আরো একপ্রকার অনুরাগও থাকে। যা নিয়ে রচিত হয়েছে জার্মান ছাত্রদের বিখ্যাত সঙ্গীত। "হাইডেলবার্গে হৃদয় হারিয়েছি।" আমাদের ভাষায় আমরা তেমন কোনো সঙ্গীত পাইনি, তাই গাইনি। প্যারিসে চিন্তামণি কর মাত্র এক বছর ছিলেন, আরো কয়েক বছর থাকতেন, যদি না মহাযুদ্ধ বেধে যেত। তিনি হৃদয় হারাননি, মাথাও হারাননি, শিল্পীদের জীবনের সব দিক দেখেছেন। নানা দিগ্‌দেশাগত শিল্পী। কেউ চিত্রকলার। কেউ ভাস্কর্যের। মোমার্ত আর মোপারনাস। আহা, কী মধুর নাম। চীন জাপান থেকেও তরুণরা ছুটে আসে পতঙ্গের মতো, সোভিয়েট রাশিয়া থেকেও, শিল্পী মহল তো কমিউনিস্টে কমিউনিস্টে ছয়লাপ। তাদের মধ্যেও নারীঘটিত ঈর্ষা। একজন প্রতিভাবান শিল্পীকে তার স্বদেশীয় বন্ধুর চক্রান্তের ফলে আত্মহত্যা করতে হলো।

এমনি অনেক কাহিনী আছে চিন্তামণি করের "স্মৃতিচিহ্নিত" নামক আত্ম-কথায়। প্যারিসে অসংখ্য আতলিয়ে তথা স্টুডিও। তার একটি আতলিয়ের নাম 'আকাদেমী দ্য লা গ্রাঁদ শমিয়ের'। সেখানে দুটি চিত্রণ, একটি ভাস্কর্য ও তিনটি এক রং বা পেনসিলের দ্রুত অঙ্কন পদ্ধতির দ্বারা মডেলের অনুকৃতি বিভাগ ছিল। ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন রোদ্যাঁর শিষ্য বুর্দেলের পর বুর্দেলের শিষ্য WLERICK. দেখছি গ্রন্থকারের মতে শব্দটির উচ্চারণ

ভেলরিক। ভেলরিক বিস্মিত হয়ে বলেন, "শিব, বুদ্ধ, নটরাজ স্রষ্টাদের ছেড়ে শিখতে এসেছ আমাদের কাছে।" চিন্তামণি উত্তর দেন, "সেসব শিল্পীর সন্ধান আজকাল আর ভারতে মেলে না। ভারতের শিল্প ইতিহাসে যে বিরাট ফাঁক আছে তারই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে এই বিরাট স্রষ্টাদের শেষ শিখাটুকু।" ভেলরিক বলেন, "বুদ্ধ শিবের স্রষ্টারা তো তাঁদের রচনার প্রেরণা বা কর্মকৌশল বিদেশে গিয়ে অর্জন করেন নি। ছেনী হাতুড়ি নিয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন পাহাড়ে। প্রকৃতিই তাঁদের প্রেরণা ও শিক্ষা দিয়েছিল সে মহান মূর্তিগঠন কৌশলের। তাঁদের রচনা এবং প্রকৃতি হবে তোমার গুরু। যাও দেশে গিয়ে কাজ আরম্ভ কর।"

প্যারিসে ভাস্কর্য শিখতে হলে দিগম্বর জৈন মূর্তির নয়, দিগম্বরী যুবতীর প্রকৃতিদত্ত জীবন্ত মূর্তিকে মডেল করে তার চারধারে দল বেঁধে ঘিরে বসে কাদা-মাটি দিয়ে গড়তে হয়। দলের মধ্যে শিক্ষার্থিনীও থাকেন। মডেলদের মধ্যে উঁচু ঘরানাও দেখা যায়। উদ্দেশ্য অমরত্ব। একদিন তাঁদের মূর্তি শিল্পসংগ্রহে স্থান পাবে। ফ্রান্সের সমাজ তাঁদের অশ্রদ্ধা করে না। শিল্পরসিকরা সমাদরই করেন। কারো কারো ভালো ঘরে বিয়েও হয়ে যায়। বিখ্যাত শিল্পীদের জীবনে এরকম ঘটেছে। নারীও তো প্রকৃতি। আমাদের দেশে নারীকেও প্রকৃতি বলা হয়। বিশেষ করে বৈষ্ণবীদের। প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখে যাঁরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না, একমনে তপস্যা করে যান, তাঁরাই অগ্নিপরীক্ষা জয়ী প্রকৃত রূপদক্ষ। চিন্তামণি তাঁদের একজন।

পাথর খোদাইয়ের কাজ শেখাতেন অধ্যাপক জিওভানেল্লি। চিন্তামণিকে দেখে তিনি বলেন, "এত ভদ্রবেশী লোকেরা যে প্রস্তরশিল্পী হতে পারে সে বিশ্বাস আমার নেই। তোমার মতো কত লোক এই আতলিয়েতে এসে আমার ধৈর্য এবং সময় নষ্ট করে চলে গেছে। তারা দু'ঘণ্টা পাথর পিটে শক্ত ব্যাপার বুঝে দু'একদিনের পর আর আসেনি।"

এর পর বড় একটা পাথরের টুকরো একটা স্ট্যাণ্ডের উপর লাগিয়ে বলেন, "এটাকে কাটতে শুরু করো।" শিষ্য প্রশ্ন করেন, "কেটে কী তৈরী করব?" গুরু উত্তর দেন, "কিছু না। কেবল পাথরটাকে কেটে শেষ করে দাও।"

অবিকল এই নির্দেশই দিয়েছিলেন প্রথম শিক্ষাগুরু গিরিধারী মহাপাত্র, উৎ-কলীয় ভাস্কর। তবে পাথরের বেলা নয়, কাঠের বেলা। শিষ্যের পছন্দ হয়নি। তিনি যান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের অবনীন্দ্র শিষ্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে চিত্রাঙ্কন শিখতে। একদিন দেখেন গুরু ছবির কাগজে চিত্ররূপের বিন্যাস-

করণে একটি পায়ের খসড়া এঁকে মুছে আবার তার পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন বারম্বার। পরে প্রায় হতাশায় বলে ওঠেন, "তোমার পায়ে মাথা রেখে স্বয়ং কৃষ্ণই হিমসিম খেয়ে গেছেন আর আমার মতো নরাধমকে সে পা তুমি সহজে বানাতে দেবে।" রাধার পদাশ্রিত কৃষ্ণের নতমস্তক তার চিত্রপ্রত্যাশাকে তুষ্ট করলেও রাধিকার পদপল্লবের ঈপ্সিত গঠন রূপকারের চোখে ঠিক ধরা দিচ্ছিল না। ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিত্ররচনার মূল প্রেরণা ও বিকাশের উৎসে ছিল তাঁর বৈষ্ণবীয় ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তির রূপায়ণে উৎসর্গীকৃত চিত্রভাবনা। গ্রন্থকারের মতে তিনি এদেশের ফ্রা আঞ্জেলিকো। অর্থাৎ প্রি-রাফেলাইট।

চিন্তামণির বয়স সে সময় পনেরো ষোল। মনঃস্থির করতে না পেরে তিনি দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলেন। অপ্রত্যাশিতরূপে ডাক এল বীরভূমের জেলা শাসক গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের কাছ থেকে। গ্রামে গিয়ে পল্লীগৃহের অন্দরের দেওয়ালে আঁকা পুরনো ছবির নকল করে আনতে হবে। বয়সের পরিমাণ এত কম হতে হবে যাতে অন্দরমহলের মহিলাদের কাছে তার উপস্থিতি আপত্তিজনক হবে না। নকলনবিশ স্যাহোরা গ্রামে গিয়ে অনেকগুলি অপরূপ ছবি নকল করে আনেন। নাড়ুগোপালকে মা যশোদারা প্রতিদিন পালা করে এক এক বাড়ী থেকে ক্ষীর খাইয়ে আপ্যায়িত করতেন। বিদায় নিতে হৃদয়ে বেদনার মোচড়ানি ভোলা সহজ হয়নি।

এমনি করে ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভাস্কর্য, ঐতিহ্যাশ্রয়ী চিত্রকলা ও পরম্পরাগত লোকশিল্পে তাঁর হাতে খড়ি হয়। এর পরে কলকাতায় ফিরে প্রাণের দায়ে বইপত্রের জন্যে ফরমায়েসী ছবি আঁকেন। কমার্শিয়াল আর্টেরও হাতে খড়ি হয়, ভাগ্যক্রমে বীরভূমের একটি স্কুলে তিনি ড্রইং মাস্টারের চাকরি পান। গতানুগতিক অঙ্কন। মন লাগে না। ঘটনাচক্রে কলকাতায় বোয়কি নামক এক হাঙ্গেরিয়ান বংশসম্ভূত আমেরিকানের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে যায়। তাঁকে বিলেত যাত্রার সংকল্প জানালে তিনি উৎসাহ দেন। মাস্টারি করে যা জমেছিল তা দিয়ে কেনা হয় জাহাজের প্যাসেজ। নিজের আঁকা দশখানা ছবি দেওয়া হয় ডাক্তার বোয়কির হাতে। তিনি আমেরিকায় ফিরে সেসব ছবি বিক্রী করে লণ্ডনের ঠিকানায় একশো বিশ পাউণ্ড পাঠিয়ে দেন। সেই টাকা নিয়ে চিন্তামণি প্যারিসে চলে যান। লণ্ডনে শিল্পশিক্ষার সুযোগ সুবিধা পাননি। প্যারিসে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাঁদ শমিয়ের নামক বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন।

শিল্পশিক্ষা কেবল স্কুল কলেজে হয় না। তার বাইরেও একটা শিল্পপরিমণ্ডল

আছে। সেটা প্যারিসে যেমন লণ্ডনে তেমন নয়, মিউনিকে যেমন বার্লিনে তেমন নয়। বহুকালের শিল্পীপরম্পরা, অতি যত্নে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত শিল্পসংগ্রহশালা, শিল্পীদের কর্মশালা, তাঁদের প্রিয় কাফে রেস্তোরাঁ, তাঁদের পক্ষপাতী ক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষক, তাঁদের ধার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার মতো হোটেলের বা দোকানের মালিক, তাঁদের প্রেমভাগিনী নারী, তাঁদের অত্যাবশ্যক মডেল। আরো বড়ো কথা, পথ দেখিয়ে দেবার মতো শিক্ষক ও উৎসাহ দেবার মতো সমজদার। এছাড়া দশ বিশ বছর অন্তর অন্তর বদলে যাওয়া শিল্পসংক্রান্ত 'ইজম'। ক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজম, রিয়ালিজম, সুররিয়ালিজম, ফোভিজম, কিউবিজম, এমনি কতরকম মতবাদ। তার লেখাজোখা নেই। এসব যে কেবল চিত্রকলায় নিবদ্ধ তা নয়। ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্পেও প্রসারিত। মায় সাহিত্যে। সব রকম শিল্পী ও সাহিত্যিকের মেলামেশা প্রতিষ্ঠানের বাইরেই হয়। প্রধানত কাফেতে বা রেস্তোরাঁতে। মাঠেঘাটে সর্বত্র তাঁদের নিজের নিজের কাজ করতেও দেখা যায়। গোটা শহরটাই যেন শিল্প শিক্ষাশালা।

চিন্তামণি অনেক বিখ্যাত শিল্প অধ্যাপককে দেখেছেন অধ্যাপনার সময় কোনো একটি ভালো শিল্পরচনার উদাহরণ দিয়ে তাকে কেমন করে দেখে অনুশীলন করতে হবে তার উপদেশ দিয়ে ছাত্রদের লুভর, লুকসেমবুর্গ প্রভৃতি সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দিতে। তাঁরা বলেন, হাত তো কাজ করে না, চোখের আজ্ঞা পালন করে মাত্র। যদি শিল্পী হতে চাও তো আগে চোখ তৈরি করে নাও। চোখ তৈরি করার পক্ষে প্যারিসের মতো ঠাঁই আর কোথায়। ছিল হয়তো আমাদের দেশেই, কিন্তু সে তো তার কালোপযোগী নয়। মাঝখানে সুদীর্ঘ ব্যবধান। অতীতের সঙ্গে জোড় মেলানোর চেষ্টা যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু মেলেনি। মিলবেও না।

তা বলে কি পশ্চিমের সঙ্গে মিলবে। সেখানেও সন্দেহ। আমাদের শিল্পীরা পুরোদস্তুর পাশ্চাত্য হতেও পারছেন না। জাপানেও এই একই সমস্যা। ওকাকুরা শেষ বয়সে অত্যন্ত অসুখী ছিলেন তাঁর সারাজীবনের প্রয়াস নিষ্ফল দেখে। তিনি চেয়েছিলেন জাপানী শিল্পীদের পুরোপুরি প্রাচ্য করতে। পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাব পরিহার না করলে পুরোপুরি প্রাচ্য হওয়া যাবে না। কিন্তু চারদিকে মডার্ণ হওয়ার ধুম পড়ে গেছে। আর্টেই বা নয় কেন। আর মডার্ণ বলতে যা বোঝায় তা পশ্চিমেই প্রাণবন্ত। তার দৃষ্টান্ত। এক বছর বাদে যখন চিন্তামণি পশ্চিম থেকে স্বদেশে ফেরেন তখন তিনি রোদ্যাঁ, বুর্দেল, ভেলরিক ও জিওভানেল্লির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত। তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেছে। জিউসেপি

বলে একজন বৃদ্ধ অঙ্কনশিল্পী ছিলেন জিওভানেল্লির ছাত্র। একদিন কাঠের একটি হাত বাক্স তিনি অযাচিতভাবে চিন্তামণিকে উপহার দেন। তাতে ছিল বিভিন্ন আকারের ফলাযুক্ত নানা রকমের বহু ছেনি ও পাথর কাটার দুটি ভারী হাতুড়ী। ঐ বাক্সে কেবল নিজের ব্যবহৃত ছেনি হাতুড়ী ছিল না, তাঁর পিতা ও পিতামহের ব্যবহার করা জিনিসও ছিল। বংশপরম্পরায় এই পরিবার কত শতাব্দী ধরে ধারাবাহিকভাবে পাথরে মূর্তি গড়ে এসেছে। নিঃসন্তান জিউসেপির জীবনে সেই ধারা নিঃশেষ হয়ে যেত। চিন্তামণি তাকে বহমান রেখেছেন।

না, শিল্পের জগতে কোনো প্রাচ্য পাশ্চাত্য ভেদ নেই। শিল্পীরা সবাই সবাইকার আপনার লোক। নইলে ইটালিয়ান জিউসেপি ভারতীয় চিন্তামণিকে তাঁর যাবতীয় যন্ত্রপাতি দান করবেন কেন। সেই একটি বছরে কতজনের স্নেহ প্রীতি ও শুভেচ্ছা লাভ করে চিন্তামণি যখন স্বদেশে ফেরেন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ। আত্মকথা এইখানেই বন্ধ অর্থাৎ অসমাপ্ত। যুদ্ধের পর তিনি আবার ইউরোপে যান, লণ্ডন প্যারিসে দশ বছর থেকে আরো শেখেন ও আরো কাজ করেন, ফিরে আসার পর আবার যান ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। এখন আটষট্টি বছর বয়সেও তাঁর একদণ্ড বিশ্রাম নেই। একটার পর একটা মূর্তি গড়ে চলেছেন। পুতুল নয়। তফাৎটা কোথায় দেশের লোককে সেটা বুঝতে হবে। এ বই যাঁরা মন দিয়ে পড়বেন তাঁরা তা বুঝবেন। উপন্যাসের মতো আকর্ষণীয়। বহু উপাখ্যানে ভরা। বিচিত্র সব চরিত্র আর তাদের নিয়তি! চিন্তামণি সাহিত্যিকও হতে পারতেন, এমনি তাঁর ভাষার উপরে দখল। আমি তো মনে করি এটি একটি সাহিত্যকীর্তি।

১৯৮৫